‘পাশবালিশ’-এর রাজনীতি
মমতা ব্যানার্জির
ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি
— পৃঃ ৭

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

৭২ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ২০ জুলাই, ২০২০।। ৪ শ্রাবণ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

মুখ্যমন্ত্রীর করোনা দমন

বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट
एजुकेशनल चैरिटी के
लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध हैं।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ৪ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২০ জুলাই - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

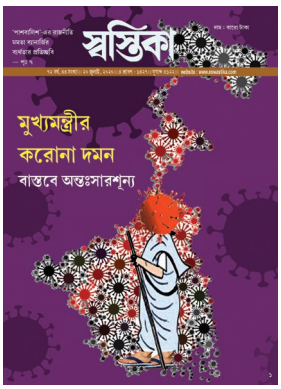

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

ভাইরাসের নখে ক্ষতবিক্ষত পাশবালিশ

▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৫

'পাশবালিশ'-এর রাজনীতি মমতা ব্যানার্জির ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি

▯ সুজিত রায় ▯ ৭

মুখ্যমন্ত্রীর করোনা দমন ▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ১০

মুখ্যমন্ত্রীর করোনা-পাশবালিশ ফেটে সংক্রমণ বেড়েছে অতি দ্রুত ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ▯ ১২

করোনা মহামারীর সময় ভারতীয় সমাজের সহজাত নমনীয়তা বিশ্বের সমক্ষে প্রমাণিত ▯ সুরেশ যোশী ▯ ১৬

মার্কিন রাষ্ট্রপতির করোনা মহামারীর মোকাবিলা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনেতাদের নেতিবাচক শিক্ষা দেবে

▯ ফ্রাঙ্ক এফ ইসলাম ▯ ১৯

লাদাখে চীন-ভারত বিবাদের রহস্য উদ্‌ঘাটন ও সমাধান

▯ ডা: আর এন দাস ▯ ২১

করোনা মহামারীর মধ্যেও জঙ্গিরা থেমে নেই : জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারে ▯ ২৫

দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের এখন মূল টার্গেট শ্যামাপ্রসাদ

▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৭

জওহরলাল নেহরু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ▯ ২৯

পুঞ্জীভূত ধার মেটানোর মানসচর্চা থেকেই স্বদেশী জাগরণ করতে হবে ▯ ড: কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩২

বিক্রমাদিত্যের দশমরত্ন ▯ আত্মজা বসু ▯ ৩৭

চিঠিপত্র : ৩৫

সম্পাদকীয়

রাজ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা

এখন হইতে চার মাস পূর্বে ভারতে যখন করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল—তখন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করোনার ভয়াবহতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, দিল্লির শাহিনবাগের ঘটনা হইতে নজর ফিরাইবার জন্য কেন্দ্র সরকার করোনার গুজব ছড়াইতেছে। অবশ্য অচিরেই তাহাকে ঢোঁক গিলিতে হইয়াছিল। করোনার প্রকোপ যখন সমগ্র দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও ভয়াবহ আকার ধারণ করিল, তখন এই মুখ্যমন্ত্রীই বলিলেন—করোনাকে পাশবালিশের মতো জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়ুন। করোনার এই সংকটকালে কোনো দায়িত্বশীল প্রশাসক এইরকম লঘু মন্তব্য করিতে পারেন কিনা—সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতেই পারে। তবে, করোনার মোকাবিলায় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়াছেন—এমন দাবি তাহার অতি বড়ো ভক্তও করিবে না। বরং, প্রথমাবধি দেখা যাইতেছে, মুখ্যমন্ত্রী এবং তাহার প্রশাসনের অদূরদর্শিতা, সমস্যা মোকাবিলায় আন্তরিকতার অভাব এবং চটুল প্রচারের বাসনা এই রাজ্যে করোনা সমস্যাকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। এখন পরিস্থিতি সত্যই এমন সৃষ্টি হইয়াছে যে, রাজ্যের মানুষকে এখন করোনাকে পাশবালিশের মতো জড়াইয়াই শুইয়া থাকিতে হইবে। লকডাউন পর্বের শুরুতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সপারিষদ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া চকখড়ির গোল গোল দাগ কাটিয়া প্রচারের আলো কুড়াইয়াছেন। প্রত্যহ সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া কেন্দ্র সরকারকে গালাগালি দিয়াছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঠিক আছে বলিয়া মিথ্যা আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় অতি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কর্মগুলিই তিনি করেন নাই। লকডাউন চলাকালীন সময়ে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগেই বেশ কিছু করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র তৈয়ারি করা যাইতেই পারিত। তাহা করিলে বিনা চিকিৎসায় করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের এখন এই রাজ্যে মরিতে হইত না। সেই প্রয়োজনীয় কাজটি করিবার তাগিদ মুখ্যমন্ত্রী অনুভব করেন নাই। লকডাউনকে একশো শতাংশ কার্যকর করিবার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রীর অনীহা লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিশেষত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে লকডাউন কার্যকর করিতে প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। করোনা মোকাবিলায় একশো শতাংশ লকডাউন যখন প্রয়োজনীয় ছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত থাকিয়াছেন সংখ্যালঘু তোষণের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে। পেটোয়া সংবাদমাধ্যমে কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়া করোনা মোকাবিলায় একটি গ্লোবাল অ্যাডভাইসরি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কমিটি অদ্যাবধি করোনা মোকাবিলায় কী পরামর্শ দিয়াছে, বা আদৌ কোনো পরামর্শ দিয়াছে কিনা— তাহা কাহারো জানা নাই। পশ্চিমবঙ্গে অতিমারী করোনা যখন নাগরিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছে, কলিকাতার রাজপথে যখন করোনা আক্রান্ত রোগীর মরদেহ পড়িয়া থাকিতেছে—তখন ইহা বুঝিতে অসুবিধা হইতেছে না যে, মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত দাবিই ছিল একটি ফুলানো বেলুন মাত্র। সেই বেলুনটি এখন চুপসাইয়া গিয়াছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটি এখন বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আসলে চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য কখনো সম্পন্ন হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালাকির দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। করোনা পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিয়াছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদ্যন্ত ব্যর্থ একজন প্রশাসক। এইরকম একজন ব্যর্থ প্রশাসক রাজ্যবাসীকে সুরক্ষা প্রদান করিতে পারেন না। মমতা ব্যানার্জি বাঙ্গলার গর্ব নন, তিনি বাঙ্গলার লজ্জা।

সুভাষিতম্

খদ্যোতো দ্যোততে তাবদ্ যবন্নোদয়তে শশী।
উদিতে তু সহস্রাংশৌ ন খদ্যোতো ন চন্দ্রমাঃ।।

যতক্ষণ চন্দ্র উদয় হয় না, ততক্ষণই জোনাকি জ্বল জ্বল করে। কিন্তু সূর্যোদয় হলেই জোনাকি ও চাঁদ দুটোই ম্লান হয়ে যায়।

ভাইরাসের নখে ক্ষতবিক্ষত পাশবালিশ

সন্দীপ চক্রবর্তী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন তাঁর কাছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রধানত দুটি প্রত্যাশা ছিল। এক, চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গ যে রাহুগ্রাসে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তিনি তার থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্ত করবেন। দুই, তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ আবার শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের একটি অগ্রগণ্য রাজ্যে পরিণত হবে। বলাবাহুল্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের সেই প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বাম জমানাতেই পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতি-সর্বস্ব একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বাঙ্গালি সমাজের মাথা হয়ে উঠেছিল সমাজবিরোধীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র চুরি, দুর্নীতি ও অপরাধমনস্কতার কারণে খবরের শিরোনাম হয়েছে। অযোগ্য ও অশিক্ষিত প্রশাসন এবং প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দলদাস রাজনীতির অনুপ্রবেশ এই রাজ্যের আইডেন্টিটি হয়ে উঠেছে। বিষয়টি আরও ভালো ভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা করোনা মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিচার করি। বস্তুত, করোনা ভাইরাসের প্রকোপে পৃথিবীর বহু দেশ কম-বেশি বিপর্যস্ত। ভারতও মহামারী থেকে বাঁচতে পারেনি। রাজ্যে- রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ। প্রায় সাড়ে আট লক্ষ মানুষ সংক্রামিত। সুস্থ হয়ে ওঠার হার প্রায় সত্তর শতাংশ এবং মৃত্যুর হার তিন শতাংশের কম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতির পরিমাণ বিশাল। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের হাল সাঙ্ঘাতিক। কারণ এখানে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। হাসপাতালে জায়গা নেই, কোনও অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র নেই, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলির অবস্থা খুব খারাপ। এই অবস্থায় মানুষের প্রশ্ন, আমরা তা হলে কোথায় যাব?

সম্প্রতি বেলঘরিয়ার শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতা আরও নগ্ন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তীব্র শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে থাকা শুভ্রজ্যোতিকে নিয়ে ওর বাবা-মা চারটি হাসপাতালের দরজায়-দরজায় ঘুরেছেন কিন্তু কোথাও ভর্তি করাতে পারেননি। কারণ হাসপাতালে জায়গা নেই। শেষে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে শুভ্রজ্যোতির মা সুইসাইড করার হুমকি দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ ভর্তি নিতে বাধ্য হন। এবং তখন জানা যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলেছিলেন। সেই সময় অন্তত তিনটি বেড খালি ছিল। চিকিৎসা শুরু করেও অবশ্য কোনও লাভ হয়নি। চোদ্দ ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় থাকার ফলে শুভ্রজ্যোতি মারা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই ওর বাবা এই মৃত্যুকে 'হত্যা' বলেছেন এবং অভিযোগের আঙুল তুলেছেন প্রশাসনের দিকে। আশার কথা, একমাত্র সন্তানের এহেন মর্মান্তিক 'হত্যাকাণ্ডের' বিচারের যে দাবি তিনি পেশ করেছিলেন আদালত তা অস্বীকার করেনি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, শুভ্রজ্যোতির দেহ রাজ্য সরকার পোস্টমর্টেম করে আদালতকে তার রিপোর্ট দেবে। এই নির্দেশ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, শুভ্রজ্যোতির কোভিড-১৯ ছিল বলে যে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করেছেন আদালত তাতে ক্লিনচিট দেয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। গত এক দশকে পরিবর্তন শব্দটি পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় বেরোলেই চোখে পড়ে একের পর এক বিলবোর্ড। সেখানে তার হাসিমুখ। পাশে লেখা 'বাংলার গর্ব মমতা'। অন্তত কোভিড-১৯ দেখিয়ে দিয়ে গেল বাঙ্গলার গর্বের বাঙ্গলার লজ্জায় পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে বিনা চিকিৎসায় কোভিড-১৯ রোগীর মৃত্যুর উদাহরণ কি শুধু শুভ্রজ্যোতি? নাকি, অনেকেই এভাবে মারা যাচ্ছেন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনে চলা এ রাজ্যের মিডিয়া সেসব খবর বেমালুম চেপে দিচ্ছে? কারণ প্রশ্ন উঠেছে চন্দননগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেবদত্তা রায়ের মৃত্যু নিয়েও। একজন আটত্রিশ বছর বয়সি মহিলা শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়ার মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে মারা গেলেন? বিশেষ করে তিনি অন্য কোনও অসুখে ভুগছিলেন কী না সেটা যেখানে স্পষ্ট নয়। কিংবা, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে চন্দননগরেরই প্রাথমিক শিক্ষিকা সৌমী সাহার কথা। সৌমীর বয়সও বেশি নয়, মাত্র চৌত্রিশ। তিনিও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বেশিদিন যুঝতে পারেননি। প্রশ্ন হলো, এরা যেসব হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সেখানে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য ন্যূনতম যে ব্যবস্থা থাকা দরকার তা ছিল তো? এ কথা সর্বজনবিদিত পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ হাসপাতালে পর্যাপ্ত আইসোলেশন ওয়ার্ড নেই, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নেই, অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই, তার থেকেও বড়ো কথা যথেষ্ট ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নেই। অন্যদিকে এসব নিয়ে সরকারি তরফে মিথ্যে তথ্যের অপর্যাপ্ত

জোগান আছে। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত, অসহায়।

চাপ যত বাড়ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ততই বালখিল্যের মতো আচরণ করছে। বস্তুত, করোনা ভাইরাসের ফাঁস গলায় চেপে বসা শুরু হওয়ার সময় থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং একটার পর একটা দিশাহীন মন্তব্য করে গেছেন। তিনি কখনও বলেছেন লক্ষ লক্ষ লোকের কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠেছে, এত মানুষ কীভাবে সংক্রামিত হলেন? তিনি তার কোনও সদুত্তর দেননি। কখনও আবার হাসপাতালগুলিতে নার্সের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে বলেছেন যে একটি সাধারণ মেয়েকে ট্রেনিং দিয়ে নার্স তৈরি করতে মাত্র তেরোদিন লাগে। তাহলে কেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নার্স তৈরি করে নিচ্ছেন না? এর পাশাপাশি তিনি বলেছেন করোনা ভাইরাসকে পুরোপুরি বিদায় করা সম্ভব নয়। একে পাশবালিশের মতো মেনে নিতে হবে। আবার এই মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি রাজ্যে কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কোনও দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রী কি এই ধরনের বেলাগাম কথাবার্তা বলতে পারেন? অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উদ্ধব ঠাকরে বাদে দেশের অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের কথা বিবেচনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে— না, পারেন না। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ, বিহারের নীতীশ কুমার ও ওড়িশার নবীন পট্টনায়কের মতো সদর্থক ভূমিকা নিতে পারতেন। তার জন্য তিনি সময়ও পেয়েছিলেন প্রচুর। তিনি চাইলে পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হল ভাড়া নিয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের সংখ্যা বাড়াতে পারতেন। হাওড়া, বারাসাত, কল্যাণী, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ির স্টেডিয়ামগুলিকে অস্থায়ী হাসপাতালে রূপ দেওয়া যেতে পারত। এমনকী ভাড়া নেওয়া যেতে পারত ইডেন গার্ডেন্সও। লকডাউনে বন্ধ থাকা স্কুল- কলেজগুলিও কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারত। কিন্তু এসব কিছুই হলো না। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত অ্যান্টিজেন টেস্টই চালু হলো না। পর্যাপ্ত প্লাজমা ব্যাঙ্ক তৈরি হলো না, ল্যাব তৈরি হলো না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু পেটোয়া সাংবাদিকদের ডেকে নরেন্দ্র মোদীর নামে শাপশাপান্ত করে গেলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিশীহীনতা শুধু একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। পাশবালিশের যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রচারের দিন তিনি অফিস-কাছারি খোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সব সরকারি অফিস এবং কিছু বেসরকারি অফিস খুলেও গিয়েছিল। কিন্তু এইসব অফিসের কর্মীরা কীভাবে যাতায়াত করবেন তার কোনও ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী করেননি। রাস্তায় বেশি বাস ছিল না। ট্যাক্সিওয়ালারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যে যেমন পেরেছেন দর হেকেছেন। সেই সময় থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত মানুষ বাধ্য হচ্ছেন বাসের গাদাগাদি ভিড়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে। বাসমালিকদের অভিযোগ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মাত্র ২০ জন যাত্রী নিয়ে বাস চালালে তাদের লোকসান হবে। ভাড়া না বাড়ালে তাদের পক্ষে এই নিয়ম মানা সম্ভব নয়। বর্ধিত ভাড়া কত হতে পারে তাও তারা সরকারকে জানিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত ন্যূনতম ভাড়া ছিল কুড়ি টাকা। বলাবাহুল্য, এই প্রস্তাব মানা কোনও সরকারের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মানুষের ভোগান্তি এবং ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে বাসমালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত ছিল। অথচ মমতা জিদ ধরে বসে আছেন। ভাড়া বাড়াবেন না। ফলে যথেষ্ট সংখ্যায় বাস রাস্তায় নামছে না এবং সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং না মানার জন্য সংক্রমণ হু হু করে বাড়ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার বেসরকারি স্কুলগুলির ফিজের ব্যাপারেও চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। লকডাউনের সময় অনেক পড়ুয়ার বাবা-মা'র যেখানে চাকরি নেই অথবা থাকলেও তারা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না, সেখানে কেন বেসরকারি স্কুলগুলি 'এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটি'র মতো অদরকারি বিষয়কে বাধ্যতামূলক করবে তার কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সরকার বা স্কুল—কেউই দিতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার বিখ্যাত জিডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন স্কুলে এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ফিজ বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ১২০০০ টাকা করে নেওয়া হয়। আর সেশন ফি বাবদ ৮৫০০ টাকা। অভিভাবকেরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছিলেন আপাতত এই ফি দুটি বন্ধ রাখা হোক। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার চালু করা যাবে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের কথায় কর্ণপাত করেননি। এমনকী, অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সৌজন্যটুকুও দেখাননি। বাধ্য হয়ে অভিভাবকেরা স্কুলের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন যেন অযৌক্তিক ভাবে ফিজ না বাড়ানো হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের এহেন উদাসীনতায় অভিভাবকদের ক্ষোভের পারদ চড়েছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করে সরকার আরেকবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেছে। সিবিএসই এবং সিআইএসসিই-কে (এইসব বেসরকারি স্কুলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা) অনুরোধ করেছে হস্তক্ষেপ করার জন্য। কিন্তু এই দুটি সংস্থা শুধু টিউশন ফি'র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। স্কুল অন্য কোনও ফি বাড়ালে বা পরিস্থিতির সাপেক্ষে বন্ধ না করলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এদের নেই। এসব পার্থবাবুরা জানেন না, তা নয়। তবুও মানুষকে বোকা বানিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে ফিজ না দিতে পারার জন্য বহু ছাত্র-ছাত্রীর অনলাইন ক্লাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকেরা অথৈ জলে পড়ছেন। কী করবেন জানেন না, কাকে বলবেন তাও না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। গত এক দশকে পরিবর্তন শব্দটি পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় বেরোলেই চোখে পড়ে একের পর এক বিলবোর্ড। সেখানে তার হাসিমুখ। পাশে লেখা 'বাংলার গর্ব মমতা'। অন্তত কোভিড-১৯ দেখিয়ে দিয়ে গেল বাঙ্গলার গর্বের বাঙ্গলার লজ্জায় পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই। ■

‘পাশবালিশ’-এর রাজনীতি মমতা ব্যানার্জির ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি

সুজিত রায়

‘ভোর’ সাতটার আধো ঘুম আধো জাগরণে এখনো প্রায় সব ‘বিত্ত’-এর বাঙ্গালির শেষ আশ্রয় পাশবালিশ। ছেলেবেলার বাবাকে পাশবালিশ করা কিংবা সদ্য বিবাহিত দম্পতি???? পাশবালিশ ডিঙোনোর মতো নস্টালজিয়া কাটিয়ে উঠতে পারলেও চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট পেরনোর মানব জীবনে পাথুরে সত্য হয়েই জেগে আছে পাশবালিশ। আর জেগে আছে বলেই বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাশবালিশ কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকারের কলমের কলমকারি সৃষ্টিতে কোথাও আদিরসের রসেতে হাবুডুবু খেয়ে, কোথাও বা নির্ভার প্রেমের নির্জীবতায়।

দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

“বাবা ও খোকা
বামন প্রেমিকা
দুজনের পাশবালিশ,
তৃতীয় বিশ্ব
আদতে নিঃস্ব
গতি সেই পাশবালিশ।”

হ্যাঁ, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত ব্যান্ড ‘চন্দ্রবিন্দু’র গানেরই পরবর্তী কথাঞ্জলি—

“এই যে দোস্তি
কিছু অস্বস্তি
সবেতে পাশবালিশ
ডার্লিং পিলো
চার আনা কিলো
কি দারুণ পাশবালিশ।”

আলিপুরদুয়ারের কবি অরুণাভ রাহা রায় তো আস্ত একটা কবিতার বইয়েরই নামকরণ করেছেন ‘খামখেয়ালী পাশবালিশ।’

আর আখতারুজ্জুমান বিপ্লব তাঁর রোম্যান্টিকতার মাধুর্য মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে বিখ্যাত কবিতা—

‘এমন হলেও হতো
ইনসোমনিয়ার দুঃখ হয়ে
শেষ রাত্তিরে সয়ে সয়ে
তোমার আঙুল আলতো
আলতো করে আমার পাশবালিশ ছুঁতো।’

বাঙ্গালি জীবনে পাশবালিশ তাই আজন্মকাল হয়ে আছে প্রেম, রোমান্টিকতার আইকন হয়ে, আলসেমি, স্বপ্নবিভোরতা আর আরামপ্রিয় জীবনের ব্রান্ড অ্যাম্বাসাডার হয়ে।

আবহমানকাল জুড়ে পাশবালিশের এই আইকনত্ব অথবা ব্রান্ড অ্যাম্বাসাডারকে আচমকাই এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছেন আমাদের ‘কবি, শিল্পী, লেখিকা, গায়িকা, ছড়াকার’ রাজনীতিবিদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা জ্বরে জর্জরিত ওপার বাংলার একদা ডরপুকো, অধুনা

ভয়কাতুরে বাঙ্গালিকে পরামর্শ দিয়েছেন উপদেশাচ্ছলে—'করোনাকে নিয়ে ঘুমোন, করোনাকে পাশবালিশ করে নিন।'

মাত্র দুটো বাক্য। ছোটো ছোটো। তাতেই পাশবালিশের দফারফা। প্রেম, ভালোবাসার 'রোবাইয়াৎ' হয়ে ওঠা পাশপালিশকে নিমেষে বানিয়ে দিয়েছেন মর্গের কফিন যেটার গর্ভে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে শুধুই মৃতদেহরা। দোলনচাঁপা আর ছুঁইয়ের স্বপ্নালু গন্ধ ছেটোতো যে পাশবালিশ নিমেষেই নির্দয় মুখ্যমন্ত্রী তাতে মাখিয়ে দিয়েছেন পূতিগন্ধময় অস্পৃশ্য করোনায় মৃত মৃতদেহ নিঃসৃত 'আতর' আর ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, করোনা প্রতিরোধের ন্যূনতম যোগ্যতাও তাঁর নেই। তাই চাইছেন, করোনাই হোক এপার বাঙ্গলার বাঙ্গালির চিরঘুমে যাবার মহৌষধ। বাঙ্গালি যাক চিরঘুমে করোনা সংক্রামিত পাশবালিশ জড়িয়ে।

কী ভয়ংকর উপদেশ! কী নির্মম কথাঞ্জলি! কী চরম বিশ্বাসঘাতকতা এই বাঙ্গলার প্রতি যে বাঙ্গলা তাঁকে 'ঘরের মেয়ে' উপমায় ভূষিত করে ভোট গাঁথা মালায় পরপর দু'বার বরণ করে নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদে!

অনেকদিন আগে তখন মমতার মন্ত্রীসভারই বরিষ্ঠ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় (তখন তিনি কংগ্রেস বিধায়ক) একটি চরম সত্য জনসমক্ষে বলেছিলেন, ''মমতা যা বলে তা করে না। প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা যেমন ওর স্বভাব, তেমনি প্রতিশ্রুতি ভাঙাটাও ওর স্বভাব।'' মুখ্যমন্ত্রী হবার পর থেকেই ওই স্বভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কথায়, কাজে ও চরিত্রে।

এই মুহূর্তে যখন গোটা ভারতবর্ষই গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাবৃদ্ধির হিসেবের খাতায় আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে, তখন এই পশ্চিমবঙ্গও অলিম্পিক স্প্রিন্টারের গতিতেই এগোচ্ছে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে করোনাশ্রী অভিধায় ভূষিত হওয়ার পথে। এটা যে হবেই তা বোঝা গিয়েছিল সেই এপ্রিলেই যখন তিনি গোটা

কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে আট ঘন্টা ঘুরেও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাদের একমাত্র সন্তান ১৮ বছরের শুভ্রজিতের প্রাণ বাঁচাতে পারলেন না বিশ্বজিত চ্যাটার্জি ও তাঁর স্ত্রী। (ইনসেটে শুভ্রজিত)।

দেবদত্তা রায়, বয়স মাত্র ৩৮। চন্দননগরের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। ভালো চিকিৎসার খোঁজে হন্যে হয়ে কলকাতায় ঘুরে বেড়ালেও সুযোগ হয়নি। অবশেষে শ্রীরামপুর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর।

মন্ত্রীসভা, দলের এমএলএ, এমপি-দের কাউন্সিলরদের ঘরবন্দি করে রেখে একাই 'করোনাযোদ্ধা'র ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে বাজারে বাজারে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গোল গোল দাগ কাটছিলেন আর পাশে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে বসিয়ে মাইক হাতে পাড়ায় পাড়ায় মাইকিং করছিলেন—''সকলে ঘরে থাকুন, নিতান্ত প্রয়োজনে বেরোতে হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।'' আর প্রত্যেকদিন বিকেলে নবান্নের পাঁচতারা অফিসঘরে বসে 'বাণী' দিচ্ছিলেন নিয়মিত। বোঝাই গিয়েছিল— কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। করোনা রোধে পরিকাঠামো গড়ে তোলার নামে চলছে শুধুই গোয়েবলসীয় প্রচার। এককে একশো করে দেখানোর অপচেষ্টা। তাই প্রথম থেকে শুধু একাই ছিলেন গোটা প্রচার-নির্মাণের চিত্রনাট্যকার। তাঁর মতলবেই স্বাস্থ্য দপ্তর দিনের পর দিন মিথ্যা তথ্য দিয়ে গেছে। এখনও দিচ্ছে। ধরাও পড়ছে যে যখন দেখানো হচ্ছে সাগরদত্ত হাসপাতালে রয়েছে ৫০০ করোনা শয্যা, তখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সেখানে রয়েছে হাতে গোনা মাত্র ৮০টি শয্যা। বাকি ৪২০টির হিসেবটা পুরোপুরি ফোর টোয়েন্টির বাস্তবতা।

চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে এক সন্ন্যাসী মুখ্যমন্ত্রীর করোনা প্রতিরোধে পরিকাঠামো গড়ে তোলার নজির। হ্যাঁ, ওই উত্তরপ্রদেশেই যেখানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দাপটের সঙ্গে বলতে পারেন— মাত্র দুমাসে গোটা রাজ্যে গড়ে তোলা হয়েছে ৭৮ হাজার করোনা আক্রান্তদের জন্য শয্যা। বলতে পারেন— আগামী বছর থেকে আর কোনও শ্রমিককে রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না কাজের সন্ধানে, রোজগারের সন্ধানে। কাউকে গায়ে জড়াতে হবে না পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা।

না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে যেসব ধরা পড়ে না। শুধু ধরা পড়ে দু-চারটি বিক্ষিপ্ত গণপ্রহারে মৃত্যুর ঘটনা। কারণ

তিনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতির অঙ্কটা। তাঁর কৃতিত্বের অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে ওই নির্মম রাজনীতির ফর্মূলা।

উন্নয়নের ছবিটা তাই তাঁর নজর এড়িয়ে যায়। আর হয়তো তাই নিজের সামগ্রিক ব্যর্থতা ঢাকতে তাঁকে বলতে হয়— 'করোনাকে নিয়ে ঘুমোন। করোনাকে পাশবালিশ করে নিন।' তার চেয়ে স্পষ্ট করেই বলতে পারতেন— 'মরণকে সঙ্গিনী করে নিয়ে বিছানায় যান। মৃত্যুকেই পাশবালিশ করে নিন।'

হয়তো এটাই বাস্তব, হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন করোনা ভাইরাস টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কলেরার মতো আমাদের জীবনে জড়িয়ে থাকবে মৃত্যুদূত হয়ে। কিন্তু সেদিন তো আমাদের হাতে থাকবে কোনও ভ্যাকসিন, চিকিৎসার কিছু সুযোগ! আজ যখন ভ্যাকসিনের স্বপ্ন দূর-অস্ত, যখন করোনা আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে ন্যূনতম চিকিৎসা পাওয়ার আশায়, তারপর রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে হচ্ছে তখন মুখ্যমন্ত্রী (যিনি রাজ্যের অভিভাবিকা হিসেবে দাবি করেন 'আমার পুলিশ, আমার প্রশাসন, আমার মন্ত্রী, আমার চিকিৎসক' বলে) কোন সাহসে মানুষকে ঠেলে দেন মৃত্যুর দিকে। আসলে তিনি বুঝে গেছেন— করোনা প্রতিরোধে সরকারি অর্থ তিনি নয়ছয় করেছেন— তাই মানুষের পরীক্ষা হয়নি আজও। গড়ে ওঠেনি যথেষ্ট পরিমাণে আইসোলেশন সেন্টার। বাড়েনি হাসপাতালের শয্যার সংখ্যা। চিকিৎসক, নার্সরা করোনা প্রতিরোধক পিপিই বা অন্যান্য সামগ্রী পাননি। এমনকী বহু জায়গায় পৌঁছয়নি মাস্কও। পরিযায়ী শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা। পুলিশকে তাঁর করণীয় কাজ করতে দেওয়া হয়নি। পুরসভাগুলি নিষ্কর্মা হয়ে হাত গুটিয়ে বসে। নর্দমা পরিষ্কার হয়নি। ভ্যাটের জঞ্জাল জমেছে পাহাড় হয়ে। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে সেঁদিয়েছেন ঘরে। বিধায়ক, সাংসদরা নির্ভেজাল ছুটি কাটিয়েছেন ৪২০ দিন ধরে। সুতরাং মমতাদেবী ধরেই নিয়েছিলেন, বাঙ্গালির অপমৃত্যু অবধারিত। এখন সেটাই ঘটছে। মানুষ বাধ্য হচ্ছে করোনাকে পাশবালিশ করে ঘুমোতে নয়, চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিতে। মমতা ব্যানার্জি এখন নিশ্চিত, দেশের মধ্যে করোনা প্রতিরোধের ব্যর্থতায় তিনি প্রথম হবেনই। শুধু এটা দেখার জন্য আমাদের আরও দু'একটা মাস অপেক্ষা করতেই হবে— সেদিন 'করোনাশ্রী' ট্রফিটা হাতে তুলে নেবার জন্য কে বেঁচে থাকেন— মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালি নাকি মরণাকাঙ্ক্ষী তৃণমূল সরকার।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

মুখ্যমন্ত্রীর করোনা দমন

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর সরকার যেভাবে মহামারী করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করেছেন তার বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। তথ্য লুকনোর কারণে তাঁরা বিরোধী দল ও সমালোচকদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছেন। বিরোধীরা অভিযোগ এনেছেন যে কোভিড-১৯ সংকটকালে মমতা তোষণের রাজনীতিকে কাজে লাগিয়েছেন। কোভিড-১৯ আক্রমণের সময়ে তবলিগি জামাতের ধর্মীয় সমাবেশে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে ৫৪ জন ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই সনাক্ত করা হয়েছে বলে ১ এপ্রিল শ্রীমতী ব্যানার্জি দাবি করেছিলেন। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে ৪৪ জন বিদেশি। কিন্তু কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার বিবরণ অনুযায়ী দিল্লির জামাতের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৩২ জন তবলিগি যোগদান করেছিলেন। তার মধ্যে ১২৩ জন ভারতীয় ও ১০৯ জন বিদেশি। শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে জোর দিয়ে জানান যে নিজামুদ্দিন এলাকাকে হটস্পট ঘোষণা করার পর তাঁর সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু সেখানে লকডাউন সত্ত্বেও প্রায় ২৩০০ জন লোক থাকছিল অথচ তিনি জানান যে সরকার ১০৮ জন বিদেশি-সহ ১৭৭ জনকে কোয়ারান্টাইন করেছে, যারা নিজামুদ্দিন মরকজে তবলিগি জামাতের সমাবেশে যোগ দিয়েছিল। তাঁর দেওয়া বিভিন্ন সময়ের তথ্যের মধ্যে প্রচুর গরমিল আছে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকার বা দিল্লি সরকারের দেওয়া তথ্যের থেকেও আলাদা। জাতীয় কলেরা ও আন্ত্রিক রোগ সংস্থা (নাইসেড)-র কাছে পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট নমুনা পাঠাচ্ছে না বলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য নাইসেডের সঙ্গে কথা বলায় পরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক ফোরামের তরফে কোভিড-১৯-এর ব্যাপারে স্বচ্ছতা আনতে যথার্থ ও যাচাইযোগ্য তথ্য সরবরাহ করতে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। নাহলে চিকিৎসকদের তরফে জনগণের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর সংজ্ঞা নির্ধারণে যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যাঁরা করোনায় মারা গেছেন কিন্তু কো-মর্বিডিটি ছিল তাঁদের করোনায় মৃত বলে ধরা যাবে না। এটা নিশ্চিত করার জন্য একটা এতাবৎকাল অশ্রুত 'অডিট কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটিতে ছিলেন সরকারের আজ্ঞাবহ কিছু চিকিৎসক ও আমলা। কোভিড-১৯ রোগীর মৃত্যু চিহ্নিতকরণের জন্য এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফোরাম তীব্র আপত্তি তোলে। ফোরামের মুখপাত্র জানান যে প্রত্যেক চিকিৎসক এ ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্য এবং এই শংসাপত্রের জন্য কোনো কমিটির প্রয়োজন নেই। ২০২০-র ২৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করে যে ৫৭ জন কোভিড-১৯ রোগীর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে ৩৯ জনের কো-মর্বিডিটির কারণে মৃত্যু হয়েছে। ফোরাম আরও জানিয়েছিল যে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল ও এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রোগীরা ৫ দিনের উপর অপেক্ষা করছেন। এর মারাত্মক ফল হলো, কিছু রোগী প্রথমে নেগেটিভ ছিল কিন্তু কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল জানার জন্য হাসপাতালে দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাঁরা আক্রান্তও হতে পারেন বা হয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী এক সময়ে রাজ্যবাসীকে বললেন করোনাকে পাশবালিশ করে ঘুমোতে। এইরকম শিশুসুলভ আরও অনেক কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত। কিন্তু গত ৮ জুলাই তিনি আবার ৩১ জুলাই পর্যন্ত অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গে কোভিড-১৯-এর ঘটনা
মৃত্যু, সুস্থ, চিকিৎসাধীন মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই শেষ ১৫ দিনে

তারিখ	আক্রান্ত	মৃত
২০২০.০৬.২৩	১৪.৭২৮ (+২.৬%)	৫৮০ (+১.৯%)
২০২০.০৬.২৪	১৫.১৭৩ (+৩%)	৫৯১ (+১.৯%)
২০২০.-০৬.২৫	১৫.৬৪৮ (+৩.১%)	৬০৬ (+২.৫%)
২০২০.০৬.২৬	১৬.১৯০ (+৩.৫%)	৬১৬ (+১.৭%)
২০২০.০৬.২৭	১৬.৭১১ (+৩.২%)	৬২৯ (+২.১%)
২০২০.০৬.২৮	১৭.২৮৩ (+৩.৪%)	৬৩৯ (+১.৬%)
২০২০.০৬.২৯	১৭.৯০৭ (+৩.৬%)	৬৫৩ (+২.২%)
২০২০.০৬.৩০	১৮.৫৫৯ (+৩.৬%)	৬৬৮ (+২.৩%)
২০২০.০৭.০১	১৯.১৭০ (+৩.৩%)	৬৮৩ (+২.২%)
২০২০.০৭.০২	১৯.৮১৯ (+৩.৪%)	৬৯৯ (+২.৩%)
২০২০.০৭.০৩	২০.৪৮৮ (+৩.৪%)	৭১৭ (+২.৬%)
২০২০.০৭.০৪	২১.২৩১ (+৩.৬%)	৭৩৬ (+২.৬%)
২০২০.০৭.০৫	২২.১২৬ (+৪.২%)	৭৫৭ (+২.৯%)
২০২০.০৭.০৬	২২.৯৮৭ (+৩.৯%)	৭৭৯ (+২.৯%)
২০২০.০৭.০৭	২৩.৮৩৭ (+৩.৭%)	৮০৪ (+৩.২%)

ভিত্তিক লকডাউন ঘোষণা করলেন। ৩০ জুন পর্যন্ত আগেই ছিল। তার আগে দেখে নিই রাজ্যে করোনার হাল কিরকম। একদিনে (৯ জুলাই) করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে ১১৯৮ জনের শরীরে দৈনিক আক্রান্তের নিরিখে যা সর্বাধিক। একই সঙ্গে বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও, একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ হাজার পেরিয়েছে। মোট মৃত্যু হয়েছে ৮৫৪ জনের। আক্রান্ত আর মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। অ্যাক্টিভ কেস ৮২৩১। মোট সুস্থ হয়েছেন ১৬৮২৬ জন। এখনও পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০৫ জনের। কনটেনমেন্ট জোনে আবার কড়া লকডাউন। ৯ জুলাই বিকেল ৫টা থেকে বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন। সরকারি দপ্তর চলবে ৭০ শতাংশ কর্মী নিয়ে। ভাগে ভাগে কাজ চলবে। মেট্রো ও শহরতলীর ট্রেন চলবে না। শপিং মল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ৮ জুন থেকে চালু হয়েছে। আনলক-১-এর অংশ হিসেবে ধাপে ধাপে তা খুলে দেওয়ার কথা। পূজা, উপাসনাস্থল ও বেসরকারি অফিস খুলবে কম লোক নিয়ে। অর্থাৎ আংশিক লকডাউন চলবে আবার ছাড় যেমন চলছে তেমন চলবে। কনটেনমেন্ট জোনের চারপাশের বাফার জোন নিয়ে প্রশস্ততর কনটেনমেন্ট জোনে কড়াভাবে লকডাউন চলবে।

লকডাউন ঘোষণার তিন মাস বাদে যে সব রাজ্যের আর্থিক অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের সমান তাদের চেয়েও কোভিড-১৯ পরীক্ষার সংখ্যার নিরিখে এই রাজ্য পিছিয়ে। যেমন রাজস্থান, সেখানে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মোট কোভিড-পরীক্ষা হয়েছে ৫ লক্ষ আর এই রাজ্যে হয়েছে আড়াই লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের প্রাত্যহিক পরীক্ষার ক্ষমতা ৫০০০ নমুনা এবং রাজস্থানের ক্ষমতা ১২০০০ নমুনা। ১০টা সরকারি ও ৬টা বেসরকারি সব মিলিয়ে ১৬টা পরীক্ষাকেন্দ্র আছে এই রাজ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে খারাপ। ৩৩টা বেসরকারি ও ৮০টা সরকারি হাসপাতাল কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসা করছে। কিন্তু এই বেসরকারি হাসপাতালগুলোর বেশিরভাগ কলকাতায় আর কিছু সল্ট লেকে অবস্থিত। হাওড়ায় দুটো। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর ১৩৬৮ শয্যার মধ্যে এই মুহূর্তে মাত্র ১৯১টা খালি আছে। অথচ রাজ্যে সংক্রমণের হার ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। সরকারি হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যার সংখ্যা ৭৭৩৭। প্রতিদিন যদি ১১০০-১২০০ করে আক্রান্ত হয় তাহলে দুদিন পরে লোককে রাস্তায় পড়ে মরতে হবে।

প্রথম পর্যায়ে পুলিশ খুব সুন্দরভাবে কড়া হাতে লকডাউনের নিয়ম ভঙ্গকারীদের কঠোর হাতে দমন করছিল কিন্তু যেই মুসলমানদের গায়ে হাত পড়ল মমতা ব্যানার্জি সেই পুলিশকে কড়া শাস্তি দিলেন, তাদের ক্লোজ করলেন। সেই বার্তা পৌঁছে গেল পুলিশের কাছে। তারা হাল ছেড়ে দিল। দেখা গেল মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাস, গার্ডেনরিচ, ট্যাংরা, রাজাবাজার প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে কেউ কোনো য়িম মানছে না। মাস্ক নেই, সামাজিক দূরত্ব বিধি পালন নেই, যথেচ্ছ জমায়েত হচ্ছে। জুলাইয়ে নতুন লকডাউনে সেইসব এলাকা বাদ। এটা কিছুতেই সম্ভব নয় করোনার মতো বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ছড়ানো মারণ রোগের সঙ্গে লড়তে গিয়ে রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক যদি এমন নির্লজ্জ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন, তবে নিশ্চিতভাবে এক ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়তে চলেছে রাজ্যবাসী।

২০১১ সালের আগে রাজ্যে অন্তত বেশ কিছু উচ্চমানের বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু উদ্ভট জমি আইন, চূড়ান্ত স্বজনপোষণ, ভ্রষ্টাচার, একনায়কতন্ত্র ও প্রচেষ্টার অভাবে গত প্রায় দশ বছরে রাজ্যে একটাও বড়ো উচ্চমানের হাসপাতাল তৈরি হয়নি। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ৭০০ জন ডাক্তার নিয়োগ হলে ৪০০ জন ছেড়ে দেয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ও বেসরকারি হাসপাতালে উন্নত সুযোগ সুবিধার কারণে। প্রায় অর্ধেকের উপর চিকিৎসকের পদ খালি, নার্সদের অবস্থাও অনুরূপ। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কাজ করে না। হাসপাতালে পর্যাপ্ত আইসিসিইউ নেই, ভেন্টিলেটর নেই। শুধু বাড়িগুলো নীল সাদা রং হয়েছে, তোরণ হয়েছে। করোনার শুরুতে ঘটা করে ঘোষণা করা হয়েছিল কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ৪০০০ শয্যাবিশিষ্ট বিশেষ কোভিড হাসপাতাল করা হলো। সম্পূর্ণ মিথ্যা।

রাজ্যে স্বাস্থ্য বাজেট অবিলম্বে ২ শতাংশের পরিবর্তে ৪ শতাংশ করতে হবে। অনুৎপাদক খরচ—ক্লাবে টাকা দান, বিভিন্ন মেলা, বাণিজ্য সম্মেলন, চলচ্চিত্র উৎসব, কালচারাল অ্যামবাসাডর পোষা এসব বন্ধ করলেই তা সম্ভব। আর লকডাউন হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সব অঞ্চলে এবং কঠোর হাতে তা পালন করার অধিকার পুলিশকে দিতে হবে। ■

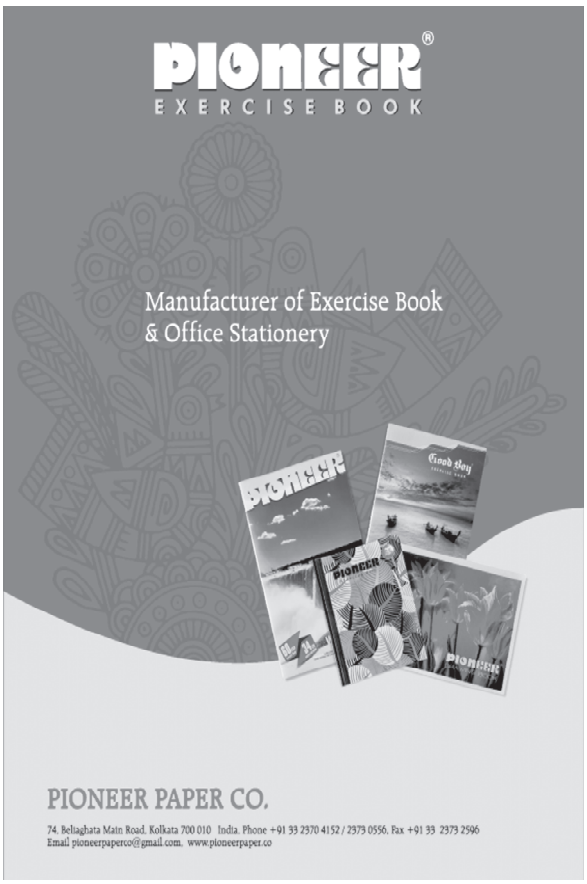

মুখ্যমন্ত্রীর করোনা-পাশবালিশ ফেটে সংক্রমণ বেড়েছে অতি দ্রুত

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গ এক অদ্ভুত রাজ্য। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় স্লোগান— 'এগিয়ে বাংলা'। পশ্চিমবঙ্গ যে অন্য সব রাজ্যের চেয়ে, গোটা দেশের চেয়ে আলাদা ও অন্যরকম, এ ধারণার প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্ট তিনি। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীও তাই নানা ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান দিয়ে বা অর্ধসত্য ও সম্পূর্ণ অসত্য প্রকাশ করে হলেও বিবৃতি দিয়ে থাকেন যে 'বাংলা ফার্স্ট হয়েছে'। করোনা সংক্রমণ মোকাবিলা নিয়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ যে করোনা- সংক্রমণ অন্য সকল রাজ্যের চেয়ে ভালোভাবে ঠেকাতে পারছে, তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে করোনা রুগিদের করোনা রুগি বলে স্বীকার করতেই চায়নি। 'ডেথ কমিটি' নামক আজব এক কমিটি গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমদিকে বেশ কিছু করোনা রুগির মৃত্যুর কারণ হিসেবে কোভিড ইনফেকশনকে দেখাতেই চায়নি। সেই সময় রুগির সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা ইত্যাদি কোনো কিছুর সরকারি হিসেবই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছিল রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গভীর রাতে গোপনে মানুষের মৃতদেহ সৎকারের ভিডিয়ো। পুলিশের গাড়িতে করে বিভিন্ন শ্মশানে দাহ করার জন্য লুকিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল শবদেহ। ধাপায় দাহকার্য চলছিল অনবরত। শহরের কবরস্থানগুলিতে দেখা যাচ্ছিল রেনকোট পরিহিত মানুষেরা কবর দিচ্ছে মানুষের মৃতদেহ। কোনো জায়গায় আবার রাতভর চলছিল মৃতদেহ কবর দেওয়ার প্রক্রিয়া, অথচ সরকারি হিসেবের খাতায় করোনা

রুগি অথবা মৃতের সংখ্যা তেমন বাড়ছিল না। এসব ঘটনা আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল জনমানসে। প্রশ্ন উঠেছিল, তথ্য লুকোনোর মাধ্যমে আদতে কী আড়াল করতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার? শোনা যাচ্ছিল, মধ্য কলকাতার কিছু এলাকায় বাড়ির ভিতর পড়ে রয়েছে করোনায় মৃত মানুষের সৎকার-না-হওয়া দেহ।

এমন আতঙ্কের পরিস্থিতির ফলশ্রুতি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনে আসে ইন্টার-মিনিস্টেরিয়াল সেন্ট্রাল টিম, যার পর ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে 'এগিয়ে থাকা'র চিত্র। আইএমসিটি-র অফিসার অরূপ চন্দ্রের কাছ থেকে কড়া 'চিঠি খেতে' হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে। সে চিঠিতে ওঠে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ এবং অবশ্যই কোভিড তথ্য তছরুপের অভিযোগ। আইএমসিটি-র সঙ্গে যে অসহযোগিতা করা হয়েছে এবং বাধা দেওয়া হয়েছে, চিঠিতে সে অভিযোগও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তোলেন আইএমসিটি-র দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। প্রশ্ন উঠে যায়, এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠার পরও কি পশ্চিমবঙ্গের বরিষ্ঠ আমলাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে না কেন্দ্রীয় সরকার?

তারপর ঘটে চিত্রনাট্যের পরিবর্তন। আইএমসিটি-র রিপোর্টের পর বদলে যায়

পশ্চিমবঙ্গের কোভিড সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনের ফর্ম্যাটটি। মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা সংবাদমাধ্যমের সামনে বিবৃতি দেন তাড়াহুড়োয় কোভিড তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে সরকারের তরফ থেকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে গিয়েছে। তাঁর এমন বিবৃতির পরেই দৈনিক সান্ধ্য কোভিড তথ্য পরিবেশনের সাংবাদিক সভার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। শুধু মুখ্যসচিব নন, 'এগিয়ে বাংলা'র মুখ্যমন্ত্রীও 'এগিয়ে' এসে তড়িঘড়ি বিবৃতি দেন যে 'ডেথ কমিটি' তিনি বানাননি, কে বানিয়েছে তাও তিনি জানেন না। এহেন বিবৃতির কিছুদিনের মধ্যেই অফিসিয়ালি বিলুপ্ত হয় ডেথ কমিটি। নতুন ফর্ম্যাটে সান্ধ্য দৈনিক কোভিট রিপোর্ট পরিবেশনের দায়িত্ব এসে পড়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। কিন্তু নতুন কোভিড রিপোর্ট ফর্ম্যাট প্রথম প্রকাশিত হওয়ার দিনেই দেখা যায় নতুন ফর্ম্যাটেও প্রচুর ভুলভ্রান্তি ও অসাযুজ্য রয়েছে। নতুন ফর্ম্যাটের গাণিতিক ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে সেইদিনই লিখেছিলাম ঋতম বাংলায় যেদিন কোভিড রিপোর্টের নতুন ফর্ম্যাট প্রথম প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তর থেকে। জনমানসে আবার দেখা দিতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন কোভিড রিপোর্ট ফর্ম্যাট নিয়েও নানা প্রশ্ন, রয়ে যায় নানা অমীমাংসিত ধন্ধ।

এর কিছু দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বোধ করি বুঝে গিয়েছিলেন যে তথ্য তছরুপ এ রাজ্যে চলতেই থাকবে। 'নেই পরিকাঠামোর পশ্চিমবঙ্গকে যদি জোর করে 'এগিয়ে বাংলা' মন্ত্রসিদ্ধ করে তুলতে চাওয়া হয়, তাহলে তথ্য তছরুপ ছাড়া যে উপায় নেই, তা বুঝতে মানুষকে বেগ পেতে হয় না। আইএমসিটি-র পরিদর্শনের আগে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। ১০ কোটি জনসংখ্যার রাজ্যে কোভিডের মতো ড্রপলেট-বাহিত ভাইরাল সংক্রমণ যে আগুনের মতো ছড়াতে পারে। তাকে থামাতে গেলে যে প্রথম থেকেই দ্রুত হারে কোভিড পরীক্ষা করে সংক্রামিত মানুষদের চিহ্নিত করে তাদেরকে কোয়ারান্টাইন করা প্রয়োজন এবং তার জন্য যে রাজ্যে কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা প্রথম থেকেই খুব বেশি রাখা দরকার — 'এগিয়ে বাংলা' এসব বোঝার ব্যাপারে 'পিছিয়ে' ছিল। সে বিষয়টি নিয়েও রাজ্যকে কড়া বার্তা দেয় আইএমসিটি। আইএমসিটি-র নির্দেশিকা পাওয়ার পর কিংবা তার কিঞ্চিৎ আগে থেকেই সে বিষয়টিতে গুরুত্ব সহকারে নজর দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরের তৎকালীন প্রধানসচিব বিবেক কুমার। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাড়তে থাকে কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা ও সেইসঙ্গে রুগির সংখ্যাও। কিন্তু এর পরেই বিবেক কুমারকে বদলি করে দেওয়া হয় পরিবেশ দপ্তরে। পশ্চিমবঙ্গে কোভিড রুগির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য বিবেক কুমারকে দায়ী করা হয়েছিল কি? নিন্দুকরা বলছিল যে 'এগিয়ে বাংলা'র মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন পরীক্ষা না করে রাজ্যে কোভিড রুগির সংখ্যা কম রাখতে। পরীক্ষা না করলেই রোগ ও রুগি ধরা পড়ত না। কিন্তু বিবেক কুমারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড টেস্টের ল্যাবরেটরির সংখ্যা একলাফে অনেকগুলি বেড়ে যাওয়ায় বৃদ্ধি পায় পরীক্ষার সংখ্যা এবং রুগির সংখ্যাও। তার পরেই বদলি হয়ে যান বিবেক কুমার। আইএমসিটি-র তরফ থেকে মন্তব্য করা হয় যে বিবেক কুমারের এই বদলি আদতে তাঁর 'ভালো কাজের শাস্তি'। কোভিড সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে ব্যাপক কোয়ারান্টাইন ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেসব ব্যবস্থা করে 'পয়সা নষ্ট' করতে বোধ করি চায়নি এ রাজ্যের লেজিসলেশন। সে টাকা কি তুলে রাখা হয়েছিল 'এগিয়ে বাংলা'র ক্লাবের ছেলেদের আনন্দ উৎসবের জন্য?

মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে গোটা ভারতবর্ষ যখন কড়া ভাবে পালন করেছে লকডাউন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় তখন লকডাউনের নামে চলেছে ছেলেখেলা। মুখ্যমন্ত্রী চালু রেখেছিলেন ফুলের বাজার, মিষ্টির দোকান ইত্যাদি। লকডাউনের সময় খোলা বাজারগুলিতে লোকের থিকথিকে ভিড়। পুলিশের গা ছাড়া ভাব থেকেও বোঝা গিয়েছিল যে এ রাজ্যে লকডাউন ঠিকভাবে করে পালন করা হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ যে অন্য সব রাজ্যের চেয়ে, গোটা দেশের চেয়ে আলাদা ও অন্যরকম, লকডাউন লকডাউনের মতো করে পালন না করেও তা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেনি 'এগিয়ে বাংলা'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'পশ্চিমবঙ্গ বসে আছে একটি করোনা টাইমবোমার ওপর'— এমন একটি রিপোর্ট সানডে গার্ডিয়ান লাইভে বেরিয়েছিল এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন তাতে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। অথচ এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে করোনা পজিটিভ লোকেরা এবং তাদের বাড়ির লোকেরা হোম কোয়ারান্টাইনের থাকুন। কারণ লক্ষ লক্ষ লোকের কোয়ারান্টাইনের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছিল তবে কি পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ পজেটিভ? মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের আদত তাৎপর্য বোঝা গিয়েছিল জুন মাসে আইসিএমআর-এর সেরোলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্টের পরে। ২৮ জুন আইসিএমআর-এর সোরো-সার্ভে সূচকে শীর্ষে পাওয়া গেল কলকাতাকে। করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণের মাত্রা বুঝতে এ রাজ্যে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্বমেদিনীপুর, আলিপুরদুয়ার ও বাঁকুড়ার মানুষের রক্তে LgG অ্যান্টিবডির খোঁজে রক্তপরীক্ষা করেছিল আইসিএমআর। ছ'টি জেলার মধ্যে কলকাতায় ৩৯৬ জনের মধ্যে ৫৭ জনের শরীরে পাওয়া গিয়েছিল LgG অ্যান্টিবডি। এই হিসাবে কলকাতার ১৮.৩৯ শতাংশ মানুষের করোনা সংক্রমণ হয়েছে বলে ধরা যায়। সেই হিসেবে কলকাতার জনসংখ্যা যদি প্রায় দেড়কোটি হয়, তবে আইসিএমআর সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী শুধু শহর কলকাতাতেই করোনা পজিটিভের সংখ্যা জুন মাসের শেষে এসে হওয়া উচিত প্রায় ২১ লক্ষ। অর্থাৎ অনুমান করা শক্ত নয় যে এপ্রিলের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আদতেই ছিল লক্ষ লক্ষ, জুন মাসে এসে যার কিউমুলেটিভ সংখ্যা হয়তো দাঁড়িয়েছিল ২১ লক্ষে।

অসাবধানতাবশত 'এগিয়ে' মুখ্যমন্ত্রী হয়তো সেটিই বলে ফেলেছিলেন।

তারপর ২৯ মে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যে লকডাউন বাস্তবত তুলে নিতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মানুষকে পরামর্শ দিলেন করোনাকে পাশবালিশের মতো জড়িয়ে ধরতে। রাজনীতি-সচেতন মানুষ তাঁর এরকম বক্তব্য শুনে অনুমান করেছিল যে রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করতে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো আর চাইছেন না। পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন ধীরে ধীরে রাজ্যে ঢুকতে শুরু করেছেন এবং তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড সংক্রমণ যখন অতি দ্রুতগতিতে বাড়বে বলে প্রত্যাশিতই ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই করোনাকে 'পাশবালিশ' করতে বলে মানুষকে কি সচেতন ভাবেই বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এগিয়ে থাকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চাননি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরুক। পরিযায়ী শ্রমিক বহনকারী শ্রমিক- স্পেশাল ট্রেনগুলির নাম তিনি দিয়েছিলেন 'করোনা এক্সপ্রেস'। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক কোটির কাছাকাছি) রাজ্যে এসে পৌঁছলে তাঁদের কোভিড টেস্ট, কোয়ারাইন্টাইন, চিকিৎসা ও খাদ্যদ্রব্যাদির ব্যবস্থা করার দায় নিতে রাজ্য অনিচ্ছুক ছিল বলে ভাবা অযৌক্তিক নয়, কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই সবকিছুর পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অভাব রয়েছে। এই খাতে সরকারি অর্থব্যয়ের সদিচ্ছার অভাবও রয়েছে বলে সন্দেহ করা যায়। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর রাজ্যের জনকল্যাণ প্রকল্পগুলির সিএজি প্রসেস অডিটে সহযোগিতা করেনি। সন্দেহ করার এটিই প্রধান ও ন্যায্য কারণ। সরকারি তহবিল তছরুপ না হয়ে থাকলে অর্থদপ্তর প্রসেস অডিটে অসহযোগিতা করে অডিট বানচাল করল কেন? মুখ্য প্রশ্ন এটিই। পশ্চিমবঙ্গে পরিকাঠামোর অভাবের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে যখন সংবাদমাধ্যম তুলে ধরেছে যে শ্রমিকদের কোয়ারান্টাইনের

রাজ্যের এত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলেই রেকর্ড খারাপ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের। সেই ক্ষোভে হাসপাতালগুলির রোগী-ভর্তি- প্রত্যাখ্যান-ষড়যন্ত্র মানুষের ওপর শাসকদলের সন্ত্রাসের অপর এক পরিকল্পিতপদ্ধতি হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে যাই হোক, দুর্নীতিতে 'এগিয়ে বাংলা'র এই নৈরাজ্যের নিশ্চিত শিকার কেবলমাত্রই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

বন্দোবস্ত করা হয়েছে এমনকী টয়লেটের মধ্যেও। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ ভারতীয় রেলমন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে নেওয়ার বিষয়টি হয়তো পছন্দ হয়নি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর। সেই জন্যই হয়তো-বা কিঞ্চিৎ ক্ষোভের বশেই রাজ্যে লকডাউন সহসা তুলে দিয়ে মানুষকে আরও দ্রুত করোনা সংক্রমণের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই বোধহয় পরামর্শ দিয়েছিলেন করোনাকে পাশবালিশ করে নেওয়ার।

এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪০ হাজারেরও বেশি কোভিড পরীক্ষার ফলাফল অপ্রকাশিত রেখেছিল মে মাসের শেষ দিকেই। অর্থাৎ যে সময়ে করোনাকে পাশবালিশ করতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই সময়েই সরকারি ল্যাবরেটরিগুলি থেকে অপ্রকাশিত ছিল ৪০ হাজারেরও বেশি কোভিড পরীক্ষার ফল। তাই বর্তমানে অপ্রকাশিত সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছে থাকতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা চলতেই পারে। পশ্চিমবঙ্গের অপ্রকাশিত কোভিড পরীক্ষার রিপোর্টগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত হলে নতুন কোভিড কেস রেজিস্ট্রেশনে পশ্চিমবঙ্গ যে দিল্লিকে মে মাসেই টপকে যেত না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এতো গোলযোগের অভিযোগেই গত ১২ জুন সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ু এই পাঁচটি রাজ্যের রাজ্য সরকারের চিফ সেক্রেটারিদের কাছ থেকে রাজ্যগুলির কোভিড পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেছিলেন। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছিলেন যে উক্ত রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রুগির যত্ন কেমন হচ্ছে, হাসপাতালগুলিতে স্টাফসংখ্যা কত এবং অন্যান্য পরিকাঠামো কেমন ইত্যাদি বিষয়ে। সুপ্রিম কোর্ট এও বলেছিলেন যে প্রতিটি রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ডায়াগনস্টিক ল্যাবগুলিতে যেন কোভিড পরীক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে যাতে যে কোনো লোক চাইলেই কোভিড পরীক্ষা করাতে পারেন। অর্থাৎ অবাধ ও পর্যাপ্ত কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা রাজ্যগুলিতে রাখার ওপর জোর দিয়েছিলেন মহামান্য উচ্চতম আদালত।

এসব কিছুর সম্মিলিত ফলশ্রুতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর সেই 'পাশবালিশ' এখন ফেটে গিয়েছে। এমনভাবেই ফেটেছে যে গোটা ভারত যখন আনলক করছে, পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় তখন নতুন করে করে কড়া লকাডাউন ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে প্রশাসন। গত ৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কেন্টেন্টমেন্ট জোনগুলির সঙ্গে বাফার জোনগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে সেই এলাকাগুলিতে কঠোর লকডাউনের নোটিফিকেশন জারি করেন। অথচ আদতে গোটা দেশ যখন কড়া নিয়মে লকডাউন করছিল, পশ্চিমবঙ্গের উচিত ছিল তখনই সংক্রমণের বিস্তারকে কনটেইন করা। রাজ্যে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, মাইল্ডলি

সিম্পটোম্যাটিক রুগির সংখ্যা এপ্রিল ও মে মাসের গোড়ার দিকে ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তাদেরকে তৎক্ষণাৎ কোয়ারাইন্টাইন করে কনটেনই করতে পারলে হয়তো জুলাই মাসে এসে 'পাশবালিশ ফেটে যাওয়া' ঠেকানো যেত এবং নতুন করে লকডাউনেও যেতে হতো না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যে যথাসময়ে কোভিড ইনফেকশন কনটেইন করতে পারেনি, ২৮ জুন আইসিএমআর-এর সেরো-সার্ভের ফলাফল তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ। এই ফলাফল অনুযায়ী শহর কলকাতাতেই করোনা পজিটিভের সংখ্যা হওয়া উচিত প্রায় ২১ লক্ষ। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী গোটা পশ্চিমবঙ্গেই কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা মাত্র তিরিশ হাজারের কিছু বেশি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কোভিডের আদত বাস্তব চিত্র আর সরকারি রেকর্ডের চিত্রে আকাশ-পাতাল ফারাক বরাবরই ছিল ও আছে।

প্রশ্ন উঠে গিয়েছে যে, কোভিড ইনফেকশন এতখানি অ্যাডভান্সড্ স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পর জুলাই মাসে লকডাউন কি আদৌ এ সমস্যার কোনো সমাধান? লকডাউন ইনফেকশন ছড়ানোর গতি কমাবে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে গোটা বিষয়টি কি আরও দীর্ঘায়িত হয়ে পড়বে না? আরও বহুদিন ধরে যদি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে লকডাউনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের বাজার, যা এমনিতেই ধুঁকছে, তা তাহলে কার্যত অচল হয়ে পড়বে না কি? 'এগিয়ে বাংলা'র অরাজকতা সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শুধু প্রাণে নয়, ধনেপ্রাণে শেষ করে দেবে।

কোভিড ইনফেকশনের পশ্চিমবঙ্গে বোধ করি ঘনিয়ে উঠছে আরও দুর্নীতির মেঘ। যেমন বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলিতে কোভিড পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং হাসপাতালগুলিতে ভর্তি- প্রত্যাখ্যান-দুর্নীতি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলোকেও যেহেতু কোভিড পরীক্ষার অনুমতি দিতে হয়েছে, ফলে বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলির তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে কোভিড রুগির সংখ্যা। সরকারি ল্যাবরেটরিগুলির কোভিড পরীক্ষার ফলাফল পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপ্রকাশিত রেখে দিতে পেরেছে এবং তার দ্বারা রাজ্যে কোভিড ইনফেকশনের বাস্তব চিত্র লুকোনোর চেষ্টা করতে পেরেছে। কিন্তু বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলির রিপোর্টের ওপর যেহেতু সরকারের সেই নিয়ন্ত্রণ নেই, ফলে বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলি থেকে হু হু করে বাড়ছে কোভিড পজিটিভ রুগির সংখ্যা, আর তার দায় বর্তাচ্ছে সরকারের ওপর। প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে কোভিড ঠেকাতে সরকারি ব্যর্থতা। ফলে, সন্দেহ হয়, যে শাসক দলের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, বিশেষত হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে কিছু গোপন প্রচার যে বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলির কোভিড রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা কম। মেডিনোভা ডায়াগস্টিকের একটি রিপোর্ট সংক্রান্ত একটি প্রচার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। গোটা বিষয়টিতে দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। দুর্নীতি শাসক দল কিংবা বেসরকারি ল্যাবরেটরি, যে কোনো দিক থেকেই থাকতে পারে অথবা দুই দিক থেকেই। রিপোর্ট কেমন হলে কোন পক্ষের কতখানি লাভ হবে, তা নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে হতেই পারে ব্যবসায়িক বোঝাপড়া। কিন্তু দুর্নীতি যে দিক থেকেই থাকুক, মূল্য দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই। কেউ হারাবেন প্রাণ, কেউ দেবেন অর্থদণ্ড। একই সঙ্গে উঠে এসেছে কলকাতার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলির দিক থেকে রোগী প্রত্যাখ্যানের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের চিত্র। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইছাপুরের ১৮ বছরের শুভ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় আর দক্ষিণ বারাসাতের ২৬ বছরের অশোক রুইদাসের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালগুলির সম্মিলিত এই ষড়যন্ত্র। হাসপাতালে পরিকাঠামোর অভাব, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব এবং অমানবিক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন— তিনের ফলশ্রুতিতেই হয়তো শহর কলকাতার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলির দিক থেকে নাগাড়ে চলছে রোগী প্রত্যাখ্যান। জ্বর নিয়ে কেউ ভর্তি হতে গেলে পরীক্ষা না করেই চিহ্নিত করা হচ্ছে করোনা রোগী হিসেবে এবং তারপর শুরু হচ্ছে রিলে- প্রত্যাখ্যানের পালা। এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতাল, অফিসিয়ালি কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই প্রত্যাখ্যান করছে রোগী ভর্তি আর কেড়ে নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রাণ। উল্লিখিত দুই যুবকের কেউই আদতে করোনা আক্রান্ত ছিলেন না। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রেই সরকারি হাসপাতাল তাদের ভর্তি নেয়নি করোনা সন্দেহের বশে। মরণাপন্ন দুই যুবককে নিয়ে তাদের মা-বাবা হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন শুভ্রজিতের মা। দুই ঘটনার সাদৃশ্য ও দুই ক্ষেত্রেই সরকারি হাসপাতালগুলির একই রকম অসংবেদলশীল আচরণ এই সন্দেহের জন্ম দিয়েছে যে, সরকারি হাসপাতালগুলি এই ভর্তি প্রত্যাখ্যান ষড়যন্ত্রটি করছে হয়তো-বা সরকারের নীরব সম্মতিতেই যাতে রাজ্যর মানুষ হাসপাতালে যেতে ভয় পায়। এই ভয় সৃষ্টি করতে পারলে চাপ কিছু কমবে সরকারি হাসপাতালগুলির ওপর, সেই সঙ্গে হয়তো কমবে করোনা রোগী ভর্তি হওয়ার ঘটনাও। তাতে পশ্চিমবঙ্গে রিপোর্টেড করোনা রোগীর সংখ্যা কমবে, যা হয়তো মুখ্যমন্ত্রী চান। 'করোনা-পাশবালিশ' ফেটে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুতগতিতে করোনা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করেছে। হাসপাতালের রোগী-ভর্তি-প্রত্যাখ্যান-ষড়যন্ত্র সেই ক্ষোভজনিত কারণে সাধারণ মানুষকে 'শায়েস্তা' করার উদ্দেশ্যে হওয়া অসম্ভব কি? রাজ্যের এত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলেই রেকর্ড খারাপ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের। সেই ক্ষোভে হাসপাতালগুলির রোগী-ভর্তি- প্রত্যাখ্যান-ষড়যন্ত্র মানুষের ওপর শাসকদলের সন্ত্রাসের অপর এক পরিকল্পিতপদ্ধতি হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই বলে সন্দেহ হয়। তবে যাই হোক, দুর্নীতিতে 'এগিয়ে বাংলা'র এই নৈরাজ্যের নিশ্চিত শিকার কেবলমাত্রই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। ■

করোনা মহামারীর সময় ভারতীয় সমাজের সহজাত নমনীয়তা বিশ্বের সমক্ষে প্রমাণিত : সুরেশ জোশী

করোনা আবহে দেশে লকডাউন চলাকালীন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ জোশী (ভাইয়াজী জোশী) অর্গানাইজার সাপ্তাহিকের সম্পাদক প্রফুল্ল কেতকরকে এক সাক্ষাৎকারে একগুচ্ছ বিষয়ের উত্তর দেন। সেই কথোপকথনের নির্যাস প্রকাশ করা হলো।

□ করোনা মহামারীর এই সংকটের সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতীয় সমাজ এই মহামারীর চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন রেখেছে। আপনি এই ঘটনাবিন্যাসকে কীভাবে দেখছেন?

আমাদের প্রজন্ম এই পর্যায়ের মহামারীর সম্মুখীন প্রথম হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো দেশে যে কোনো প্রকারের দুর্যোগে এগিয়ে এসে সেবা ও সাহায্য করতে পিছপা হয় না এবং তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। করোনা মহামারীতেও তারা সেটাই করেছেন।

দেশে যখন লকডাউনের ঘোষণা করা হলো, দিনমজুর ও শ্রমিক যারা দৈনিক রোজগারের উপর নির্ভরশীল তারা এই সময় জীবন- মরণের সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং স্বয়ংসেবকরা তৎক্ষণাৎ এদের জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন রেশন ও খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করেছেন। এই সঙ্গে যখন জানা গেল যে এরা দীর্ঘদিনের কর্মহীনতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছে, স্বয়ংসেবকরা যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের রেশন কিট ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী মাসাধিককালের মতো জোগান দিয়েছেন। এই কাজটি দেশের সমস্ত জেলাতেই করা হয়েছে এবং এই কর্মযজ্ঞে দু' লক্ষের বেশি স্বয়ংসেবক নিযুক্ত ছিলেন। এরা দেশের মধ্যে এক কোটির মতো পরিবারকে সাহায্য ও ত্রাণ জোগান দিয়েছেন। প্রথম দিকে এগুলির প্রয়োজন ছিল। এই দিনগুলি অতিক্রমের পর নতুন সমস্যা এসে হাজির হলো। পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজ নিজ গ্রাম ও ছোটো শহরের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে শুরু করলো তাদের ছোটো শিশু ও বয়স্ক মাতা-পিতাদের সঙ্গে নিয়ে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা স্থানে স্থানে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার জোগানের ব্যবস্থা করেছিল। এছাড়া স্বয়ংসেবকরা এদের অন্যান্য সাহায্যেরও ব্যবস্থা করেছিল। এদের নতুন চটিজুতো বিতরণ করেছেন, পীড়িত পরিযায়ীদের ডাক্তার ও ওষুধপত্তরের ব্যবস্থাও করেছেন। প্রায় চল্লিশ দিন ধরে স্বয়ংসেবকরা এই কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর

স্বয়ংসেবকরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরিযায়ীদের নিবন্ধভুক্তি করেছেন।

দু' লক্ষেরও বেশি স্বয়ংসেবক দেশজুড়ে দুঃস্থদের ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করছেন। স্বয়ংসেবকরা সারাদেশে এক কোটির বেশি পরিবারকে ত্রাণসাহায্য ও ত্রাণসামগ্রী জোগান দিয়েছেন।স্বয়ংসেবকরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় তাদের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কীভাবে তাদের সহায়তা করতে পারেন। উৎসাহজনক ঘটনা এই যে, স্বয়ংসেবকরা এমন জায়গায় কাজ করেছেন যেখানে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ও প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা ছিল। তারা করোনা সংক্রমিত স্থানেও কাজ করেছেন এবং সেই এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীদেরও সাহায্য করেছেন। তারজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও নিয়েছেন এবং করোনা সংক্রমিত ব্যক্তিদের বাছাই করার জন্য প্রশাসনকে সহায়তা করছেন।

দিল্লিতে বিভিন্ন কারণে হেল্পলাইন গঠন করা হয়েছিল। এমনই এক হেল্পলাইন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্র ও জনসাধারণের সহায়তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য একটি হেল্পলাইন দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দির, গুরুদ্বার, জৈনমন্দির কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাপারে এগিয়ে এসে সহযোগিতা করেছেন। লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাবের মতো সংস্থাও জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছে। এই সময়ে দেশজুড়ে বহু ছোটো-বড়ো প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জনসেবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।

□ স্বয়ংসেবকরা এইসব সেবাকর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেয়ে থাকেন? তঁদের কী কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?

● আমরা কোনোপ্রকার দুর্যোগ মোকাবিলার পরিচালনায় পারদর্শী নই এবং এই কারণেই আমরা কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম নই। কিন্তু সঙ্ঘের এক প্রকার সংস্কার গড়ে তোলা হয় যার ফলে স্বয়ংসেবকরা দুর্দশা পীড়িতদের জন্য এগিয়ে এসে সাহায্য করতে সক্ষম। বহু দশক ধরেই এমনটা হয়ে আসছে আর সেই কারণেই স্বয়ংসেবকরা পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে ক্রিয়াশীল হয়। আমরা কখনও প্রশিক্ষণ দিই না, এমনকী বহু ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় সামগ্রীও দিতে পারিনি। স্বয়ংসেবকরা নিজেরাই সমাজের কাছে যান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে থাকেন।

আমাদের শীর্ষ সংগঠন থেকে কোনো প্রকার নির্দেশ বা পরিকল্পনা দেওয়ার প্রথা নেই। পরিবর্তে স্বয়ংসেবকদের স্বাভাবিক ঝোঁকই তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা এনে দেয় এবং ফলস্বরূপ মূক দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। কারণ আমরা মনে করি এই সমাজ আমাদের আপনার।

□ স্বয়ংসেবকরা অনেক সংস্থাকে প্রেরণা দিয়ে থাকেন যারা অর্থনৈতিক জগতে কাজ করে এবং আর্থিক দুর্দশার মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করে চলেছে। সঙ্ঘের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী?

● আর্থিক পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। পরিযায়ী শ্রমিকদের স্থানাচ্যুতি অনেক সমস্যাকে সামনে তুলে ধরেছে। এই সমস্যার এক দীর্ঘকালীন সমাধান গ্রহণ করার দাবি করে যেন ভবিষ্যতে এই প্রকার স্থানচ্যুতি আর না ঘটে। এই মুহূর্তে এরূপ সমস্যার সমাধান হলো পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মে নিয়োগ সুনিশ্চিত করা। নিয়োগকর্তারা কর্মচারী রাখুন কিন্তু তাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে তারা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও খেয়াল রাখবেন। অন্যদিকে এক বিশালসংখ্যক শ্রমিক নিজেদের বাসভূমিতে থেকেই জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় রোজগারপাতি করে যেতে চান। এখানেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের তাদের জন্য সুনিশ্চিত পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানীয় ক্ষেত্রে তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ইতিমধ্যে অনেক সরকার সেই পদক্ষেপ শুরুও করে দিয়েছে।

আমাদের দক্ষতা নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। যদি লোকেদের স্থানীয় প্রয়োজনের কারণে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে স্থানচ্যুতির সমস্যাটা এইভাবেই দেখা হবে যে, দক্ষকর্মী অন্য জায়গা থেকে এনে নিয়োগ করার প্রয়োজন আর থাকবে না। সুতরাং এই মহামারী আমাদের এক সুযোগ করে দিল পরীক্ষা করার ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ।

□ প্রধানমন্ত্রী মোদী 'আত্মনির্ভর ভারতের' ডাক দিয়েছেন এবং অনেক সঙ্ঘ প্রভাবিত সংস্থা এই আহ্বানে সাড়াও দিয়েছে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে 'আত্মনির্ভর' হব?

● আমরা দেখতে পাই যে আমাদের গ্রাম ও শহরে স্থানীয়ভাবে নির্মিত বহু জিনিস পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক সুন্দর ভঙ্গিমায় আহ্বান করেছেন, 'লোকালের জন্য ভোকাল', স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহ দিতে হবে। নিরীক্ষা করে দেখা দরকার যে, কোন কোন অঞ্চলের মধ্যেই স্থানীয় প্রয়োজন জোগানো সম্ভব। আমার উপলব্ধি এই, যে সমস্ত উৎপাদিত বস্তু বৃহৎ শিল্পজাত নয়, সেগুলির স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু ছোটো ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। প্রতিটি জেলাকে ক্ষুদ্র শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক। বৃহৎ শিল্পের জন্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের মতো ভাবতে হবে। এর বাইরে আমাদের বিশ্ব প্রয়োজনের উপায় করতে হবে। 'আত্মনির্ভর' হওয়ার ডাকের অর্থ আমাদের জেলাগুলিকে কেন্দ্র করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উন্নয়নের কাজ করে যেতে হবে।

ভারত-চীন দন্দ্বে 'স্বদেশী' ভাবনা বেড়ে উঠেছে। যদি দেশের কোটি কোটি লোক স্থানীয় বস্তুর উপর আস্থাবান হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে 'আত্মনির্ভর' হওয়ার পথ সহজ হয়ে উঠবে। যদি আত্মনির্ভর হওয়ার বাস্তব পরিবেশ গড়ে তোলা যায় তখন 'আত্মনির্ভর ভারত' এক স্লোগান না থেকে এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে।

□ আপনি সমস্ত পরিস্থিতির ব্যাপারে একজন স্পষ্টবাদী, কিন্তু এই আলোচ্য ঘটনা প্রবাহের একটা নেতিবাচক দিকও রয়েছে। সম্ভবত চীন-সীমান্ত পরিস্থিতি এর কারণ। চীনাদ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্ত এই সমস্ত আলোচনার কেন্দ্র। আপনি কীভাবে দেখছেন?

● এটা এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। যখন এত বড়ো চর্চা কোনো একটি দেশকে নিয়ে সারা বিশ্বে চলছে তখন স্বাভাবিক ভাবে ভারতেও চলবে। কোনো সুসংগঠিত প্রচার ছাড়াই এমনকী সাধারণ মানুষও বলছেন তাঁরা চীনাদ্রব্য কিনবেন না। কিন্তু আমার বক্তব্য যে এটা কোনো একটা দেশের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিক্রিয়া হিসেবে থেকে না গিয়ে পরিবর্তে আমাদের 'আত্মনির্ভর' হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল এইরূপ প্রচার সর্বাত্মকভাবে বিশেষ একটি দেশের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। কিন্তু ক্রমশ এই চিন্তাই আমাদের স্বনির্ভর হতে পথ দেখাবে, কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যেই বিকল্প উৎপাদন ও উৎসের

সন্ধান উঠে আসবে। এটা শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, পরিবর্তে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়ে উঠবে স্বনির্ভর হতে এবং স্থানীয়ভাবে তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে এবং কারও সাহায্য ছাড়াই নিজ সামর্থ্যে উঠে দাঁড়াতে পারবে।

□ চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কয়েক দশক ধরে চলে আসছে। এই সময়ে ভারতের প্রতিক্রিয়ায় কি কোনো পার্থক্য নজরে আসছে? রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও সীমা সুরক্ষা, সীমান্তের নিরাপত্তা এবং সীমান্তের পরিকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

● যে কোনো দেশ তার সীমানা অতিক্রমকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে মনোমালিন্য চায় না। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ একটি কৌশল ঠিক করে থাকেন সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। সেজন্য এক্ষেত্রে আমাদের কোনো মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। কারণ এটা সরকার ও সেনাবাহিনীর বিষয়। আমাদের সেনাবাহিনীর উপর সাধারণ মানুষের পূর্ণ আস্থা রয়েছে সক্ষমতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার।

□ ডিজিটাল শিক্ষা প্রণালীর কথা চলছে। কিন্তু সবাই এই ব্যবস্থায় পারদর্শী নয়। সঙ্ঘ সবসময় সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রণালীর পক্ষে। সঙ্ঘ এবং তাদের অনুপ্রাণিত সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

● এই মুহূর্তে আমাদের সংকট ভিন্ন প্রকারের এবং এক্ষেত্রে দুটি অবস্থান রয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যেগুলি সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিচালনা করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এদের সিংহভাগ আয়ের উৎস সমাজ। মনে হয় তাদের এই সমস্যা কমপক্ষে আগামী এক বছর থাকবে।

অন্য সমস্যাটি হলো দুঃস্থজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নতুন পদ্ধতিতে ডিজিটাল শিক্ষা প্রণালীর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমান সময়ে দেশের জনজাতি অধ্যুষিত আট শতাংশ অঞ্চলে আধুনিক প্রদ্ধতির উপযোগী সামগ্রী নেই। সমাজের এক বৃহৎ অংশ দারিদ্র সীমারেখার নীচে থাকায় এসব আধুনিক সামগ্রী জোগানে অক্ষম। সুতরাং আমাদের তার সুরাহা করতে হবে।

স্বয়ংসেবী সংস্থাগুলি খানিকটা এর দায়িত্ব নিতে পারে বাড়িতে ছাত্রদের কোচিং দিয়ে। সাশ্রয়ী ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান আমাদের নীতি এবং এই সময়ে আমরা ভাবছি কীভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হবে। আমাদের কাছে এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে বর্তমানে একটিও ছাত্রের যেন শিক্ষাবর্ষ বিফল না হয় তা সুনিশ্চিত করা। আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে এই সংকট থেকে আমরা বিজয়ী হবো যদি পূর্ণরূপে আমাদের সমস্ত দক্ষতাকে কাজে লাগানো যায় ।

□ মেলা, যাত্রাপালা, ধর্মীয় সমারোহ যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক যেখানে জনসাধারণ বহু জায়গায় একত্র হয়। কিন্তু করোনার কারণে এই ধরনের সমাবেশের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। সমাজ এই বিষয়টি কীভাবে দেখছে?

● এক্ষেত্রে আমি আমাদের সমাজকে প্রণাম নিবেদন করছি। হাজার হাজার বছরের পরম্পরাযুক্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত এসকল সমাবেশ। বিশ্বব্যাপী এই সংকটের কারণে এজন্য কিছু বিধিনিষেধ পালন করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজ এই বিধিনিষেধকে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ব্যাপারটিই প্রমাণ করে আমাদের সমাজ কত প্রাজ্ঞ। প্রয়োজনে কত পরিবর্তন করতে পারি। সেজন্য জগন্নাথের রথযাত্রা বিনা জনসমাবেশে হয়েছে। সূর্যগ্রহণ দেখতে কেউ কুরুক্ষেত্রে আসেনি। এতে বোঝা যায় যে মানুষ পরিবর্তনকে স্বীকার করেছে এবং তাদের আস্থা, পূজাপাঠ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান আপাতত নিজ গৃহের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এটাই ভারতীয়দের আত্মিক বৈশিষ্ট্য যা পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনে নমনীয়তা দেখাতে পারে। ভারতীয় সমাজের এই সহজাত নমনীয়তা বিশ্ব সমক্ষে এভাবেই প্রমাণিত হলো।

□ সঙ্ঘকে সবসময়েই প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, কিন্তু সমাজে এরকম গোষ্ঠীও রয়েছে যারা সমাজকে এক বা একাধিক অজুহাতে বিভক্ত করতে সদা সচেষ্ট। সঙ্ঘ কি এক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নিতে চলেছে?

● আমাদের বহু বর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে জানি এরকম বহু গোষ্ঠী আছে যারা সবসময় সমাজকে বিভক্ত ও দুর্বল করতে সচেষ্ট রয়েছে। সঙ্ঘ ক্রমবৃদ্ধিমান ও শক্তিশালী হওয়ায় এইরূপ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুঝতে সক্ষমতা দেখাতে পারে। যদি দেশবিরোধী শক্তিগুলি দেশকে দুর্বল করতে চায় সেক্ষেত্রে সঙ্ঘের মতো সংগঠন অতি অবশ্যই সমাজকে জাগ্রত করার ভূমিকা দৃঢ়ভাবে পালন করবে যাতে সমাজের দুঃস্থরা এই শক্তিগুলির কবলে না পড়ে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী যে আমাদের সামাজিক পরিকাঠামো, আমাদের সাধুসন্তদের মানসিক শক্তি, এইসঙ্গে বহু বছর ধরে কর্মরত সঙ্ঘের সাধনা এইসকল অপশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করতে কাজে লাগছে।

নিঃসন্দেহে সমাজের কিয়দংশ প্রভাবিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রভাবিত দুঃস্থজনদের ক্ষোভ অনুধাবন ও আলোচনা করে তাদের সহানুভূতির সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু যদি কিছু গোষ্ঠী এই সমস্যাগুলিকে দেশবিরোধী ভূমিকায় ব্যবহার করে দেশকে দুর্বল করার ফন্দি আঁটে সেক্ষেত্রে সঙ্ঘের মতো সংস্থা দেশবাসীকে সজাগ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সমাজকে সুনিশ্চিত করে তুলতে সচেষ্ট হয় যেন এই গোষ্ঠীর প্রচারে কেউ কর্ণপাত না করে।

□ সঙ্ঘ মনে করে ভারতের সমস্যা ভারতীয় রীতিতেই সমাধান করা প্রয়োজন। কিছু ভেদ-বিভেদ হতে পারে, সমাজে কিছু উত্তেজনা আসতে পারে, কিন্তু তা দূর করার ভারতের নিজস্ব রীতি রয়েছে। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এটি আরও মহত্ত্বপূর্ণ নয় কি?

নিশ্চয়, একেবারেই ঠিক। প্রত্যেক দেশের সমাজ রচনা ও সমাজের অভিরুচি ভিন্ন প্রকারের হয়। সেজন্য আমাদের দেশের সমস্যার উত্তর আমরা অন্য দেশে খুঁজে বেড়াই না। আমরা সমস্যা বুঝি, তার মূলে কী আছে তা জানি, তার সমাধানের রাস্তাও জানি। এজন্য ভারতের যে সমস্যা রয়েছে তা অন্যের চশমায় দেখা এবং ধার করা উপকরণের দ্বারা সমাধান হতে পারে না। এখানকার মূল কথা বুঝে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। সঙ্ঘ এভাবেই প্রয়াস করছে। এখানকার সমস্যার সমাধান এখানকার পথেই মিলবে। ভারতের সমাজ-মনকে বিকৃত করার কোনো প্রকার চক্রান্ত কোনো ভাবেই সফল হবে না। একটি কথা জরুরি যে, ইতিবাচক শক্তিগুলিতে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এটা নিশ্চিত যে সঙ্ঘ তা করতে চেষ্টা করছে।

(ভাষান্তর : দেবযানী ঘোষ)

অতিথি কলম

ফ্রাঙ্ক এফ ইসলাম

মার্কিন রাষ্ট্রপতির করোনা মহামারীর মোকাবিলা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনেতাদের নেতিবাচক শিক্ষা দেবে

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিপুল খরচে আয়োজিত, করোনা মহামারীর প্রকোপে ১৫ জুলাই পর্যন্ত যেখানে ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ মারা গেছে এবং ৩৫ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। বিশ্বের মধ্যে আমেরিকাই আজ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। পরিতাপের বিষয়, মহামারীর প্রারম্ভ থেকে ৬ মাস কেটে গেলেও আজ অবধি সেখানে ঊর্ধ্বমুখী রেখার নিম্নগামিতার লক্ষণ নেই। এই প্রচণ্ড সমস্যার মূলে শুরুর দিন থেকে আজ অবধি ভুলভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলাই কারণ। এই সূত্রে মার্কিন দেশের ১০টি ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এমন মহামারীর সময় কী কী করা উচিত নয়।

(১) মার্কিন সিদ্ধান্তগুলি যতটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেওয়া হয়েছে ততটা বৈজ্ঞানিকভাবে নয়। একেবারে শীর্ষে অবস্থানকারী ডোনাল্ড ট্রাম্পই এর উৎস। একবারে গোড়ায় তিনি এটিকে মরসুমি ফ্লুয়ের সঙ্গে তুলনা করে উড়িয়ে দেন। উপরাষ্ট্রপতিকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করতে বললেও তাঁকে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখেন।

(২) আইনের মাধ্যমে কোনো জাতীয় প্রকল্প তৈরি করে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই জারি হয়নি। উপরাষ্ট্রপতি মুখোশ ব্যবহার, পরীক্ষা করিয়ে অন্য সংক্রামিতদের খোঁজা ও চিকিৎসা শুরুর ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করলেও সবই ছিল মৌখিক। এগুলি অমান্য করলে, সামাজিক দূরত্ব ভাঙলে কোনো বাধ্যবাধকতার উল্লেখ ছিল না।

(৩) এই মহামারীকে আমেরিকায় সংখ্যায় পঞ্চাশোর্ধ রাজ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় স্তরেই এর মোকাবিলার কথা বলা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। ফলে স্থানীয় গভর্নররাই যে যার মর্জিমাফিক কাজ করেন। যা একটি রাজ্য থেকে অন্যটিতে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

(৪) কেন্দ্রীয় স্তরের মাধ্যমে (রাষ্ট্রপতির) করোনা পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, মানববর্ম ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। ফলে বিভিন্ন রাজ্য তাদের নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে একে অপরের সঙ্গে প্রায় প্রতিযোগিতায় নেমে বিভিন্ন দেশি বিদেশি সংস্থার সঙ্গে লেনদেনে বাধ্য হয়।

(৫) মহামারী সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ঘুরতে থাকে। এই সম্পর্কে গঠিত টাস্ক ফোর্স নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলন করত। কিন্তু লকডাউন উঠিয়ে দেওয়ার সময়

আসতেই ট্রাম্প এদের চুপ করিয়ে দেন। তিনি নিজের হাতে লাঠি ঘোরাতে থাকেন। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। নিজের একটি 'লারজার দ্যান লাইফ' ভাবমূর্তি তৈরি করতে চিকিৎসা-বিশারদদের পরামর্শ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। এমনকী বৈজ্ঞানিক ভাবে পূর্ণ নিরাপদ নয় এমন ওষুধ প্রয়োগ করার দুঃসাহসিক নিদান দেন।

(৬) রাষ্ট্রপতির তরফে লকডাউনের পর গোড়া থেকেই যত দ্রুত সম্ভব একে তুলে দিয়ে সবকিছু চালু করার চেষ্টা ছিল। লোকেরা গৃহবন্দি অবস্থায় অভ্যস্ত হতেই তিনি তাদের বাইরে বের করতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামীকে টুইট করে নির্দিষ্টভাবে ভারজিনাইয়া ও মিডিনান রাজ্যের গভর্নরদের শ্লথ ভূমিকার নিন্দা করে দ্রুত সেখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরাবার আবেদন জানান। এ থেকে পরিষ্কার ট্রাম্প কেবলমাত্র তাঁর নির্বাচনী ভবিষ্যতের কথাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন, জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তার ওপর নয়।

(৭) মে মাসের মাঝামাঝি বা জুনের গোড়ার দিকে কিছু রাজ্যে সংক্রমণ কমে আসছিল আবার অন্য অনেক রাজ্যে বাড়ছিল। এর ফলে কম সংক্রামিত ফ্লোরিডা, টেক্সাস, জর্জিয়া ইত্যাদি প্রদেশগুলিতে হুড়মুড় করে সবকিছু খুলে দেওয়া হয়। আজ সেখানে মড়ক লেগে গেছে।

(৮) মনে রাখা দরকার, আমেরিকার কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচায় পরিস্থিতি পরিচালনার মতো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নেই। এর ফলে সামাজিক দূরত্ব বজায়, মাস্ক পরা, গৃহবন্দি থাকা সবই রাজ্যগুলির মর্জি মাফিক চলেছে। কোনো জায়গায় ট্রাম্পের দলের

রিপাবলিকান গভর্নর যে নির্দেশ দিয়েছেন ডেমোক্রাট মেয়র তা আইন মেনে চালু করেননি।

(৯) ট্রাম্পের তরফে মানুষের শারীরিক নিরাপত্তা অপেক্ষা দেশের অর্থনীতির চাকা গড়গড়িয়ে চালানোকে ভুলভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ করে লকডাউন তুলে নিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার সিদ্ধান্তের, যা মহামারীর কারণে নিম্নগামী হয়ে পড়ছিল, আজ আমেরিকাকে বিশাল জনক্ষয়ের মাধ্যমে তার মূল্য চোকাতে হচ্ছে।

(১০) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হানিকর ছিল রাষ্ট্রপতির তরফে ধারাবাহিকভাবে ক্ষেত্র বিশারদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বিধানগুলিকে অমান্য করা। একেবারে শুরু থেকেই ট্রাম্প বিশেষজ্ঞদের উপদেশগুলি ছেঁটে দেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছোঁয়াচে রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফসির পরামর্শ পর্যন্ত তিনি না নিয়ে নিজের মনোমতো বিকল্প নিরাময় পদ্ধতি তৈরি করে এগিয়ে যান। যার পরিণতি আজ প্রকাশ্য।

সামগ্রিকভাবে কয়েকটি রাজ্যের গভর্নরদের প্রাজ্ঞ পরিচালনার কারণে কিছু অত্যন্ত প্রকোপগ্রস্ত অঞ্চল যোগ্য নেতৃত্বের ফলশ্রুতি কিছুটা ভালো অবস্থায় থাকলেও গোটা আমেরিকা এই মহামারীর শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এমন কোনো নিজ উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার জন্য দায়ী দেশের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যিনি মহামারীর কয়েকমাস ব্যাপী সময়ে কখনও মাস্ক ব্যবহার করেননি। বাধ্যবাধকতার কোনো উদাহরণ জাতির সামনে তুলে ধরেননি। কয়েকদিন হলো অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ্যে তাঁর মাস্ক ধারণ নজরে পড়ছে। তবে, তিনি অর্থহীনভাবে বারবার মানুষকে বলে যাচ্ছেন হঠাৎ রাতারাতি একদিন এই মহামারী অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এই আচরণগুলি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে ট্রাম্প এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা যাঁর কার্যকলাপ আপতকালীন সময়ে আদৌ অনুসরণযোগ্য নয়। তাঁর এই বিনাশকারী ভূমিকা বর্তমান ও আগামী দিনের নেতৃবৃন্দ কীভাবে একটি মহামারীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় সেই সূত্রে মনে রাখবে। বিশেষ করে, ভারত ও অন্যান্য দেশ এই প্রাথমিক শিক্ষাই মার্কিন দেশ থেকে গ্রহণ করবে।

এই মুহূর্তে ভারতকে বাড়তি সতর্ক হতে হবে যে বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীব্র 'লকডাউন' আদেশ জারিও প্রধানত পালিত হওয়ার পরও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ এত কিছু সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল অধরা থেকে গেছে। হয়তো খুব শীঘ্রই ভারত ১০ লক্ষ সংক্রমণ পার করার বেদনাদায়ক পরিসংখ্যান ছুঁয়ে ফেলে আমেরিকা ও ব্রাজিলের পেছনে থাকবে। আমরা চাইব এবং বিশ্বাস করতে আগ্রহী যে ভারত এই অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে যতটা কম সংখ্যা নিয়ে পৌঁছনো যায় সেই প্রচেষ্টায় সর্বাধিক সচেষ্টা হবে।

উল্লেখিত দুটি দেশের ঠিক পেছনে থাকা দেশের পক্ষে এই মুহূর্তে নিশ্চিত দুঃসংবাদ হলেও কিছু রূপালি রেখাও উঁকি দিচ্ছে। বলতেই হবে, দেশের এই মারণরোগে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। এই সূত্রে ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের করোনা রোগীর ৮০ শতাংশই মোট ৬২০টি জেলার মধ্যে ৪৯টি জেলা থেকে উদ্ভূত। এর পরিসংখ্যানগত হিসেব দাঁড়ায় আক্রান্তের সংখ্যার বিশাল পরিমাণ মানুষ দেশের মোট জেলার মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশের মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যে ৪৯টি জেলায় সংক্রমণ তার প্রবল থাবা বসিয়েছে সেখানেই আমাদের বাড়তি উদ্যমে টেস্টিং (পরীক্ষা), ট্র্যাকিং একজন হলে তার সংস্পর্শে আমাদের খোঁজ, treatne সকলেরই চিকিৎসার বা পর্যবেক্ষণে রাখার (যেখানে যা প্রযোজ্য) দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশে সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফকে (গতি) নিম্নমুখী করতে উল্লেখিত ৪৯টি জেলার হটস্পট এলাকাগুলিতেই যাতে তা সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য জেলায় না ছড়ায় তা কড়া ও অনমনীয়ভাবে করতে পারলে এই মহামারীর প্রভাব আগামীদিনে অনেকটাই কমানো যাবে।

(লেখক ওয়াশিংটন স্থিত উদ্যোগপতি ও নাগরিক নেতা)

তপন কুমার ঘোষের জীবনাবসান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন প্রচারক, পরবর্তীকালে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা তপন কুমার ঘোষ গত ১১ জুলাই করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে সঙ্ঘের প্রচারকের ব্রত নিয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে নির্বাহ করেছেন। জেলা প্রচারক, বিভাগ প্রচারক, প্রান্ত প্রচার প্রমুখের দায়িত্ব পালনের পর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সংগঠন সম্পাদক এবং বজরংদলের অখিল ভারতীর দায়িত্ব তাঁর ওপর বহুদিন ন্যস্ত ছিল। ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর এক স্নেহভাজনকে ফোনে বলেন, ' আমি স্বামীজী, ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী, মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে চলে যাচ্ছি, কোনো মৃত্যুভয় নেই, আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, আবার আসব এই ভারতমায়ের কোলে।' তাঁর মৃত্যুতে দেশের অগণিত স্বয়ংসেবক ও হিন্দুত্বপ্রেমী মানুষ একজন পরমাত্মীয় বন্ধুকে হারালো। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন হিন্দু সংহতির বর্তমান সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ জিষ্ণু বসু।

লাদাখে চীন-ভারত বিবাদের রহস্য উদ্ঘাটন ও সমাধান

ডাঃ আর এন দাস

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই মা ভারতীর তেইশ বছরের তেজস্বী সন্তান শহিদ গুরতেজকে শতকোটি নমন! ১৬ জুন, লাদাখ সীমান্তে ট্যাঙ্ক, সৈন্যবিন্যাস ও ভারতীয় সেনার নৃশংস হত্যা— চীন ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম এত উগ্রতা দেখিয়েছে। আকসাই চীনের ৩৮০০০ বর্গকিলোমিটার ও পূর্ব-লাদাখের গালওয়ান ঘাঁটি দখলই চীনের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। পিছনে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। দেশের অভ্যন্তরে বেকারিত্ব, পার্টির অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও করোনা মহামারী সারাবিশ্ব শি জিনপিংকে একঘরে করে দিয়েছে। প্রতিবেশী তাইওয়ান, হংকং, মাকাউ, তিব্বত, জিনঝিয়াং চীনের বশ্যতা অস্বীকার করে গণতান্ত্রিক দেশ হতে চাইছে। মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিস্তারবাদী চীনের এই মহাত্বাকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনাশ করতে চাইছে। এজন্যই মোদীর বিরুদ্ধে চীনের এত আক্রোশ।

২০০৫ সালেই দক্ষিণ চীনসাগর থেকে শুরু করে মালাক্কা স্ট্রেইট ও বাংলাদেশ হয়ে আরব সাগরে প্রভুত্ব বিস্তার করে চীন ভারতকে 'স্ট্রিং অব পার্ল' চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলেছিল। ভারত মহাসাগরে ভারতের প্রভুত্বকে খর্ব করে মায়ানমার, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের কাছে বন্দরগাহ ও বিমানবন্দর বানিয়ে, ওই দুর্বল দেশগুলিকে চীনাবাজারে পরিণত করেছিল। বিখণ্ডিত ভারতকে হীনবল করে, সমুদ্রশক্তি বাড়িয়ে, জলপথে আফ্রিকা ও ইউরোপের বাজার ধরাই ছিল চীনের একমাত্র উদ্দেশ্য! ২০১৪ সালে চায়না, পাকিস্তান, ইকোনোমিক-করিডোর বা 'সিপেকের' দ্বারা চীনের কাসগর থেকে আফগানিস্তান, 'পাক অধিকৃত-কাশ্মীর', গিলগিট-বালটিস্তান হয়ে বালুচের 'গ্বাদর' বন্দরগাহ পর্যন্ত ২৫০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক পরিযোজনা করে চীন। বারংবার যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তান ভারতের অধিকৃত ওই অঞ্চলগুলি চীনকে লিজ দিয়ে দিয়েছে!

মোদীর 'সিপেক' বিরোধিতাই চীনের আক্রোশ ও আক্রমণের সূত্রপাত। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার পিছনের জলপথে চীনকে ব্যয়বহুল তেল আমদানি করতে হয়।

লাদাখে চীনা সৈনিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত সৈনিকদের কথা বলছেন নরেন্দ্র মোদী।

তেহেরানের ৮ কিলোমিটার দূরত্বে হরমুজের তটভূমি দিয়ে সারা বিশ্বের ২০ শতাংশ তেল রপ্তানি হয়। বালুচিস্তানের গোয়াদরবন্দর থেকে হরমুজের দূরত্ব ৯০০ কিলোমিটার। সিপেক বাস্তবায়িত হলে সস্তায় ও স্বল্প সময়ে চীন তেল আমদানি করতে পারবে। কিন্তু গোয়াদর বন্দর ও হারমুজে চীন সৈন্যসমাবেশ করলে ভারতের সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে। রাজস্থানের দিক থেকে চীনা নৌবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কাও বাড়বে। তাছাড়া ভারতের তেল আমদানির সস্তা ও সুগম পথটিও অবরুদ্ধ হবে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মোদী দক্ষিণপূর্ব ইরানের একমাত্র বন্দর চাবাহার পুনর্নির্মাণ করে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় নৌসেনার তত্ত্বাবধানে তুলে দেন। ১৫ আগস্ট ২০১৯ সালে লালকেল্লা থেকে মোদী বালুচিস্তানের অত্যাচারিত জনগণকে অভিনন্দন জানান। অমূল্য খনিজে পূর্ণ প্রাচীন কালাতদের সৃষ্ট বালুচিস্তানের স্বাধীনতাকে নৈতিক সমর্থন জানানোয় তিনি পাকিস্তান ও চীনের কুদৃষ্টিতে পড়েন। পাকিস্তান থেকে বালুচিস্তানের বিচ্যুতি, গোয়াদর ও সিপেকের অস্তিত্বকেও অচিরেই বিলুপ্ত করবে। পাকিস্তান কাশ্মীরের মতোই ১৯৪৮ সালের ২৭ মার্চ, বালুচিস্তান জোর করে দখল করেছিল। স্বীয় সুরক্ষার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে ভারত ভুটানের পর আফগানিস্তানকেই সবচেয়ে বেশি আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা উরিতে হামলা করলে ভারত সে সময় পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে যোগ্য জবাব দেয়। ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতি আবদুল ঘানির সঙ্গে অমৃতসর শীর্ষসম্মেলনে মোদী আফগানিস্তানের সঙ্গে রক্ষা-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এদিকে রাশিয়ার পুতিন ইউরেশিয়ান-ইউরোপিয়ান ইকোনোমিক ইউনিয়নের সঙ্গে সিপেককে জুড়তে চাওয়ায় মোদীর পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে যাচ্ছিল। ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকা--- ত্রিশক্তিই আফগানিস্তানে নিজ স্বার্থে কর্তৃত্ব করতে চায়। ২০১৬ সালে মোদী ৪০ হাজার কোটি মূল্যের এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স মিসাইল ডিল করে পুতিনের সিপেক-স্বপ্নভঙ্গ করেন। কিন্তু রাশিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ২০১৭ সালে ইজরাইলের স্বল্পমূল্যের অমোঘ বারাক-৮ কিনতে নেতানহুর দ্বারস্থ হন। আমেরিকার আর্থিক বহিষ্কারে বিধ্বস্ত রাশিয়ান অর্থনীতি জিডিপির নিরিখে সারাবিশ্বে ১২তম স্থানে পৌঁচেছে। হতাশাগ্রস্ত পুতিন ২০১৮ সালে সিপেক থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোদীকে রাশিয়ান মিসাইল কেনায় রাজি করান। এতে ট্রাম্প মোদীর উপর ক্ষেপে যান। কিন্তু এপ্রিল ২০১৯ সালে মোদী ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের হেলিকপ্টার অ্যাপাচে কিনে ট্রাম্পকে ঠাণ্ডা করেন।

২০২০-র নভেম্বরে আমেরিকার নির্বাচন। ট্রাম্প তাই পাকিস্তানের শাস্তি, আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারে ভারতের অকুণ্ঠ সাহায্য চাইছেন। আফগান সমস্যার সমাধানে তালিবান, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান ও আমেরিকা ২০২০-র ২৯ ফেব্রুয়ারি কাতারে সন্ধিপ্রস্তাব পেশ করেন কিন্তু ভারত ও আফগানিস্তানের অনুপস্থিতিতে সেই শান্তি প্রস্তাব বাতিল হয়। ভারত তালিবানীদের সঙ্গে সন্ধিতে অখুশি ছিল। ১৯৭৯-১৯৮৯ সালে কাবুলে সোভিয়েত পরাজয়ের প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় পুতিন আমেরিকান সৈন্যদের হত্যার্থে তালিবানদের টাকা দিত। ২০০১ সাল থেকে আমেরিকান সৈন্যরা আফগানিস্তানে শুধু বোমা চালিয়েছে। ভারত ২০০৩ সাল থেকেই আফগানি সংসদ ভবন, বাঁধ, সড়ক, সেতু এবং নাগরিক উন্নয়নের জন্য নানা গঠনমূলক কাজ করেছে। মেডিক্যাল সহায়তা, সিভিল সোসাইটি স্থাপন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ, মহিলাশিক্ষার প্রসার, সংগীত, ক্রীড়া, বিভিন্ন শিল্পবিকাশ ও ছাত্রবৃত্তি দিয়ে আফগানদের মন জয় করেছে।

সৈন্য প্রত্যাবর্তনে ট্রাম্প ও পুটিন উভয়েরই অভূতপূর্ব লাভ হবে। ২০ বছরে আমেরিকা ২ ট্রিলিয়ন ডলার আফগানিস্তানে অপব্যয় করেছে। আমেরিকান সৈন্যের প্রত্যাবর্তনে রাশিয়ার তালিবানকে দেওয়া টাকাও বেঁচে যাবে। মস্কোর বিজয়দিবস প্যারাডে ২৩ জুন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাশিয়ায় তাঁর প্রতিরূপের সঙ্গে চুক্তি করেন। সিপেক থেকে রাশিয়া সরে এলে অক্ষম চীন একা একে রক্ষা করতে পারবে না।

চীন শুধু লাদাখে নয়, নেপালের লিপুলেখেও ১৩ মে প্রধানমন্ত্রী কেপিএস ওলির সাহায্যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেছে। চীনের এমএসএসের গুপ্তচররা ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য নেপালে পৌঁছেছে। অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যেই অসন্তুষ্ট নেপালি জনগণ এবং নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ সদস্যরাও কেপি শর্মা ওলির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করেছেন। ১৫ জুন লাদাখে ভারতীয় সৈন্যের শৌর্য ও বীরত্বে চীনারা যা শিক্ষা পেয়েছে তাতে শি জিনপিং ভবিষ্যতে সতর্ক হয়েই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। করোনার কারণে সারাবিশ্ব আজ চীনকে দোষী সাব্যস্ত করলেও ভারত কিন্তু নিরপেক্ষ থেকেছে। পারমাণবিক শক্তিধর চীন ও পাকিস্তান এখন সমগ্র পৃথিবীতে দুষ্ট ক্ষতের মতো। মোদীর সঙ্গে ১৩০ কোটি ভারতীয় থাকলে অদূর ভবিষৎতে জম্মু-কাশ্মীরে গিলগিট- বালটিস্তানের বিলয় হবেই। শান্তিপ্রিয় ভারত চায় পাক-অধিকৃত বালুচিস্তান, গিলগিট-বালটিস্তান-সহ কাশ্মীর, চীনের কবজা করা কারাকোরাম ও আকাসাই চীন এবং গ্রসিত তিব্বতের অবিলম্বে মুক্তি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, পাকিস্তানের কবজা থেকে গিলগিট-বালটিস্তানকে বিমুক্ত করেই জম্মু-কাশ্মীরের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ হবে। বালুচিস্তান একদিন স্বাধীন রাষ্ট্র হবেই। মোদীর দূরদৃষ্টি, অজিত দোভালের খুরধার বুদ্ধি, চীন-বিশেষজ্ঞ এস জয়শংকরের কূটনীতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বামৈস্লামিকদের ঠাণ্ডা করার আইন এবং ত্রিবাহিনীর সিডিএস বিপিন রাওয়াতের অদম্য সাহসে পাকিস্তান ও চীনের চক্রান্ত অবশ্যই বিফল হবে।

মোদী বিস্তারবাদী চীনের আগ্রাসন ও ঔদ্ধত্য এবং পাকিস্তানের ইসলামি জঙ্গিবাদ সারাবিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্যই ১৯ জুন পাকিস্তান স্টক-এক্সচেঞ্জের সন্ত্রাসী হামলাকে ভারতের ষড়যন্ত্র--- পাক-চীনের এই যৌথ অভিযোগকে সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ সরাসরি খারিজ করেছে। এই মুহূর্তে চীনের সামরিক শক্তিকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য ভারতের থাকলেও ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইজরায়েল, জাপান ও আমেরিকা সাহায্য করতে ছুটে আসবে।

চীনের ইচ্ছা পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার মতো ভারতকেও তার অধীনতা স্বীকার করিয়ে দাস বানিয়ে রাখা। কিন্তু মোদী প্রধানমন্ত্রী থাকতে সেটা অসম্ভব! তাই মোদীকে হটানোর জন্য ক্ষমতালোভী দেশদ্রোহীদের কাজে লাগাচ্ছে চীন।

সাম্প্রতিক করোনায় সারাবিশ্বে পাঁচ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু আর ৫.৮-৮.৮ ট্রিলিয়ন ডলারের লোকসানে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলি ছাড়াও ১২৩টি দেশ চীনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের আদালতে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া-সহ ৬টি দেশ প্রযুক্তি, কারিগরিবিদ্যা চুরি ও সাইবার হ্যাকিংয়ের জন্য চীনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তিব্বত, হংকং, তাইওয়ান, মাঞ্চুরিয়া, মাকাউ প্রভৃতি ৭টি দেশ মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী চীনের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। বিস্তারবাদী চীন ৭ দশক ধরে ১৪টি দেশের সঙ্গে সীমান্তবিবাদে লিপ্ত আছে। ১৯৪১ সালে তিব্বতকে গ্রাস করেছে। এখন ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও লাদাখকেও থাবা বসাতে চাইছে। ভুটানের ডোকলামে ২০১৭ সালে ১৬ জুন ভারতীয় সেনার পরাক্রমে চীন পিছু হটতে বাধ্য হয়।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মোদী আগ্রাসী চীনকে প্রতিরোধ করার জন্য কতকগুলি প্রয়োগ করে চলেছেন। প্রথমত, সামরিক শক্তিতে বলীয়ান বর্তমান ভারত লাদাখের গালওয়ান ঘাঁটিতে,১৬ জুন সারাবিশ্বকে দেখিয়েছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব। বিস্তারবাদী চীন যথারীতি ভারতের উপরে দোষ চাপিয়ে নিরপরাধ সাজছে! এখন কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে সীমান্তবিবাদের মীমাংসা করা হচ্ছে। মোদী 'মন কী বাত'-এ স্পষ্টই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সারাবিশ্ব মুগ্ধ চোখে স্তব্ধ হয়ে দেখেছে, ভারতের এক টুকরো জমি কবজা করার যথোপযুক্ত শাস্তি! হতবাক চীনও এরকম ভয়ানক মুখোমুখি লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়ে এএনআর-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৫ জন সৈন্যকে হারিয়েছে। কিন্তু প্রবল জনরোষের কথা চিন্তা করে সরকারি ভাবে চীন সেই সংখ্যা প্রকাশ করছে না।

দ্বিতীয়ত, ১৯ এপ্রিল থেকেই চীন-সহ বিদেশি কোম্পানিগুলির উপর আত্মনির্ভর ভারত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্বদেশি শিল্পের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করেছে! দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায়, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট নীতির আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। করোনা মহামারীতে পীড়িত দেশের অনেক মুমূর্ষু শিল্পকেই চীন অধিগ্রহণ করার ফিকিরে ছিল। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে স্ন্যাপডিল, ওলা, জোমটো, সুইগি, ওইও ইত্যাদি সাফল্যমণ্ডিত উদ্যোগগুলিতে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নিবেশিত পুঁজির পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থমন্ত্রকের অবগতি ছাড়াই ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি হাউসিং ব্যাঙ্ক, এইচ ডি এফ সি-র ১.৭৫ কোটি শেয়ার কিনে লালচীন বিপদসংকেতের সূচনা করে। অবশ্য যথাসময়ে তার যথাযোগ্য মোকাবিলাও করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ১৮ জুন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জরুরি মিটিংয়ে ঘোষণা করে করোনা মহামারীতে সারাবিশ্বে ১০.৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারত ছাড়া আমেরিকা, জাপান, আফ্রিকা, ইউরোপীয়ান দেশগুলি সমেত বিশ্বের ১২৩টি দেশের প্রতিনিধিরা চীনের বিরুদ্ধে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে কোভিড-১৯-এর উৎপত্তিস্থল চীনের উহানের ভাইরোলজি গবেষণাগারে তদন্ত

ও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়। চীন চিরাচরিত প্রথায় সরাসরি অস্বীকার করে এই অভিযোগ। এই স্বাক্ষর-অভিযানে ভারত অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশ হওয়ায় চীনের এত গোঁসা,

চতুর্থত, ভারতই একমাত্র দেশ যে বিস্তারবাদী চীনের এই ভূমিবুভুক্ষাকে নিরস্ত করার সামর্থ্য রাখে এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিকেও প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য দিয়ে চীনের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারে। তিব্বতকে ১৯৫১ সালে গিলে ফেললে ধর্মগুরু দলাই লামাকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়। ধর্মশালায় অস্থায়ী সরকার গঠনের মাধ্যমে তিনি চীনর বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর জনমত জোগাড় করেছিলেন। মহাশক্তিধর চীনের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে দক্ষিণ চীনসাগরের দেশগুলি আজ ভারতের সাহায্য চাইছে। ভিয়েতনাম ছাড়াও অন্যান্য দেশও ভারতের বিখ্যাত ব্রহ্মোস মিসাইল কিনছে। সম্প্রতি চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনী জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের সঙ্গে যৌথ যুদ্ধাভ্যাস করছে। বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখি ও রাহুল কাসওয়াল ২২ মে, তাইওয়ানের মহিলা রাষ্ট্রপতি সাই-ইং-ওয়েনের দ্বিতীয় দফার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে চীনের ওয়ান নেশন পলিসির নামে জমি-জিহাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট, মাইক পোম্পিও-সহ ৯২টি বিভিন্ন দেশের অফিসারের সঙ্গে বার্তালাপ করেন। যথারীতি চীনের অভিযোগ, 'ভারত চীনের অভ্যন্তরীণ মামলায় হস্তক্ষেপ করছে'।

পঞ্চমত, ভারত-সহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলি বহুদিন ধরে চীনের আগ্রাসন সহ্য করে আসছে। কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক জিহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ও সাহস পাচ্ছিল না। এখন ভারতকেই তারা রক্ষাকর্তা হিসেবে মেনে নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এশিয়ায় প্রভুত্ব করার বাসনায় এবং বিখণ্ডিত ভারতকে দুর্বল করার পরিকল্পনায়, নেপাল, পাকিস্তান এবং দেশীয় কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলে চীন ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সিপেক পরিযোজনায় ৫০ বিলিয়ন ডলার পাকিস্তানে নিবেশ করে চীন ক্রীতদাস পাকিস্তানকে শোষণ করে চলেছে। শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্যের অছিলায় ঋণজালের মরণফাঁদে ফেলে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আফ্রিকান দেশগুলি তাই আজ চীনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। ২৯ জুন, ভারত সরকার বাধ্য হয়ে দেশের সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্বের কথা বিবেচনা করে ৬ বিলিয়ন আয়কারী টিকটক-সহ ৫৯টি চীনা অ্যাপকে বেআইনি ঘোষণা করেছে।

চীনে ইউটিউব, গুগল বা টুইটার নিষিদ্ধ কিন্তু তাদের নিজস্ব অ্যাপগুলি যেমন উইচ্যাট, সেয়ারইট ইত্যাদির দ্বারা অন্য দেশের গ্রাহকদের মোবাইল বা ল্যাপটপ থেকে গোপন তথ্য চুরি করে চীনের সারভারে পাঠিয়ে তার বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি বিশেষ এবং প্রতিবেশী দেশগুলির অপূরণীয় ক্ষতি করছে। প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সর্বগ্রাসী চীনা কমিউনিজম নিজে সংরক্ষণবাদের সাহায্য নিলেও অন্য কাউকে নিতে দেবে না। মনে আছে, ২০১৫ সালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কীভাবে দিল্লিতে ৭০টার মধ্যে ৬৭টি আসন জিতেছিলেন? নোয়াডাতে বসে চাইনিজ ইজিএম হ্যাকররা কমিউনিস্ট কেজরিওয়ালের জন্য এই কাজ করেছিল। চীনের ইচ্ছা পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার মতো ভারতকেও তার অধীনতা স্বীকার করিয়ে দাস বানিয়ে রাখা। কিন্তু মোদী প্রধানমন্ত্রী থাকতে সেটা হবে অসম্ভব! তাই মোদীকে হটানোর জন্য চীন ক্ষমতালোভী দেশদ্রোহীদের কাজে লাগাচ্ছে। সাধারণ মানুষ যাতে বিপক্ষ নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও মোদী বিরোধিতায় বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন, তার জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে সচেতন থাকতে হবে। ■

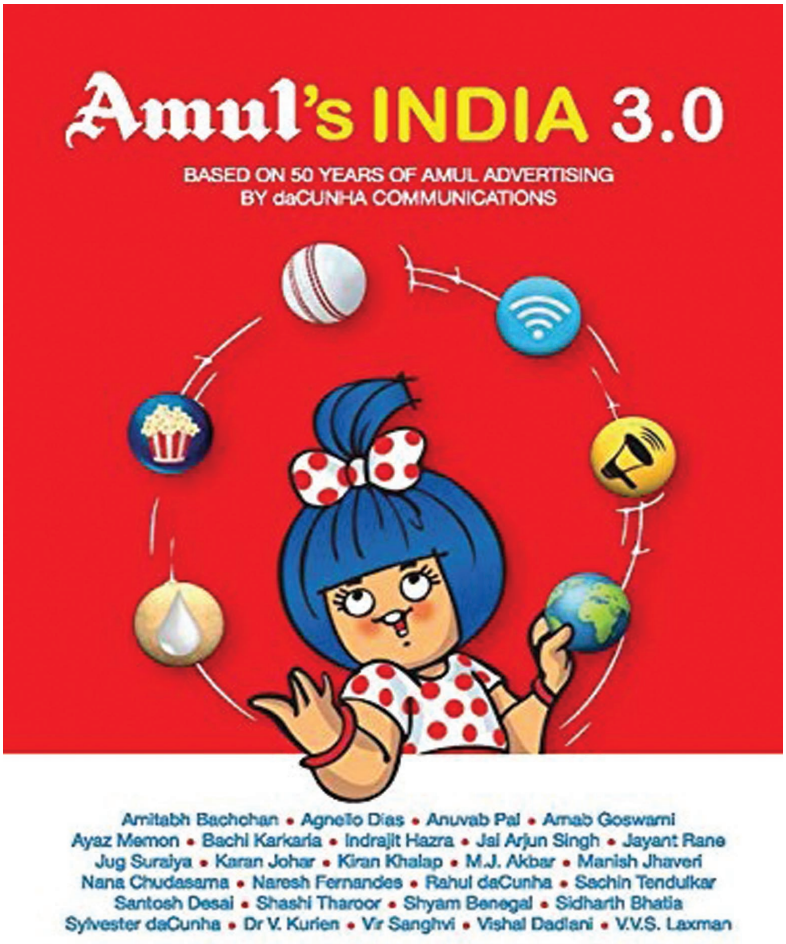

করোনা মহামারীর মধ্যেও জঙ্গিরা থেমে নেই

জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। ইউরোপে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিদের কোভিড-১৯ উপদ্রুত অঞ্চলে ভ্রমণ সতকর্তা জারি করেছিল। তবে যতদূর জানা যাচ্ছে সে জায়গা থেকে তারা সরে এসেছে। এখন বলছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে বাহিনীগুলো তাদের দমিয়ে রেখেছিল, তারা এখন চাপে আছে। বিভিন্ন দেশে সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সংকট আসন্ন। আঘাত হানার এখন এটাই মোক্ষম সুযোগ।

বাংলাদেশের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের গোড়ার দিকে অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের তৎপরতা থেমে থাকেনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন সূত্র বলছে, এ সময়টাকে জঙ্গিরা কাজে লাগিয়েছে অনলাইনে সদস্য সংগ্রহের কাজে। সাধারণ ছুটির পর জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর মুখপাত্ররা বিভিন্ন এনক্রিপটেড অ্যাপে (গোপনীয়তা নিশ্চিত করা যায় যে অ্যাপগুলোয়) চ্যানেল খুলে প্রচার চালাচ্ছে।

গোয়েন্দা তথ্য বলছে, জঙ্গিরা আবার পুনর্গঠিত হওয়ার চেষ্টায় আছে। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র জানায়, আইএস বিশ্বব্যাপী হামলার জন্য যে যে পরিস্থিতিকে অনুকূল বলে মনে করছে, বাংলাদেশে তার সব কটিই ঘটতে পারে। সাধারণ মানুষের ধর্মভীরুতাকে পুঁজি করে অনেককে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থও হয়েছে তারা। বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচজন ইতিমধ্যে সৌদি আরবে চলে গেছে। ঢাকা থেকে সৌদি আরবে যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার হয়েছে আরও আটজন। এখনো সাত-আটজন নিখোঁজ। তাদের বেশিরভাগ প্রকৌশলী। নেতারা তাদের বুঝিয়েছে, কোভিড-১৯ হলো পৃথিবী ধ্বংসের আলামত। তাই এখনই ইমাম মাহাদির অনুসারী হতে দেশ ছাড়া প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, জঙ্গিবাদ বিষয়টা মনস্তাত্ত্বিক। মহামারীতে ওটা থেমে নেই। যারা ইতিমধ্যেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে, মহামারী তাদের মাথা থেকে উগ্রবাদকে সরাতে পারেনি। তবে সব সময় যে জঙ্গিরা হামলা ঘটাচ্ছে, তা নয়। এখানে আরও বেশকিছু পক্ষও জড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সার্বক্ষণিক নজরদারি প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সামরিক শাসনের মধ্যে আশির দশকে ইসলামি উগ্রবাদের সূচনা হয়। কার্যত ১৯৮৬ সালে মুসলমান মিল্লাত বাহিনীর উত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সাংগঠনিক সূচনা হয়। ১৯৯২ সালে যশোরে সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচীর সম্মেলনে বোমা হামলা চালিয়ে সহিংস উগ্রবাদের সূচনা করে দলটি। ২০০১ সালে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামি লিগের সমাবেশে হামলা-সহ ১৬টি হামলায় ১৪৫ জনকে তারা হত্যা করে।

নানা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে বাংলাদেশে তৎপরতা আছে ২০০০ সালের দিকে গঠিত জামা আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (যেটিকে পুরোনো জেএমবি বলা হয়), মূল দল থেকে বেরিয়ে আসা নব্য জেএমবি, আনসার আল ইসলাম ও হিযবুত তাহরীরের। তৎপর এই চারটি সংগঠনই আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর ভাবাদর্শ অনুসরণ করে থাকে। ফলে বিশ্লেষকেরা বাংলাদেশকে ঝুঁকির বাইরে রাখতে চাইছেন না।

পুরোনো জেএমবির মূল কেন্দ্রই এখন ভারতে। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সালাউদ্দিন সালেহীনের নেতৃত্বে চলা এ দলটির বেশ কিছু নেতা সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে গ্রেপ্তার হয়েছে। কারও কারও ভারতে চলে যাওয়ারও নজির আছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নব্য জেএমবি-র নারী শাখার প্রধান আসমানি খাতুনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার সঙ্গে ভারতে অবস্থানরত জঙ্গিদের নিবিড় যোগাযোগের প্রমাণ পায় পুলিশ। সবশেষ গত মে মাসের শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হয় আবদুল করিম ওরফে বড়ো করিম। ভারতীয় সংবাদপত্র জানায়, এই করিম জেএমবি-র রসদ জোগান দেয় এবং সালাউদ্দিন সালেহীনের আশ্রয়দাতা।

জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের মুখপত্র আন নাবা মার্চের শেষ দিকে তাদের পুরবর্তী পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস

গ্রুপ আন নাবায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করেছে। ক্রাইসিস গ্রুপ বলছে, হামলার লক্ষ্যস্থল হিসেবে আইএসের পছন্দ পশ্চিমি বিশ্ব ও তাদের ভাষায় পশ্চিমের ‘নাস্তিক্যবাদী সরকারের’ সহযোগিতায় চলা মুসলমান দেশগুলি। ক্রাইসিস গ্রুপ ৩০টি দেশের ৪৭ জন সদস্যের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মঞ্চ। এই মঞ্চে তারা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করে থাকেন। বিভিন্ন দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাবেক কর্মকর্তারা এর সদস্য। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা ও প্রস্তুতির ঘাটতি থেকে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল অস্ত্র ব্যবহারের একটা সুযোগ নিতে পারে।

পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) অবশ্য এ মুহূর্তে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা না করলেও তারা অবশ্য মনে করেন ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদী কার্যক্রম বাংলাদেশের বাইরের দেশগুলোর জঙ্গি তৎপরতার ওপর নির্ভর করে। নিউজিল্যান্ডে মসজিদে হামলা ও শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলার পর বাংলাদেশে জঙ্গিদের মধ্যে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা দেখা গেছে। সেদিক থেকে সতর্ক থাকার কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহাব এনাম খান অবশ্য মনে করেন, জঙ্গিদের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সবকিছু জানা যাচ্ছে না। যতদূর ধারণা করা যায়, জঙ্গিরা তাদের কার্যক্রমের ধরন বদলেছে। তারা ডার্কওয়েব ব্যবহার করছে। যেখানে নজরদারির সুযোগ সামান্যই।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সূত্রগুলো বলছে, ভার্চুয়াল যোগাযোগের একটা অংশ বিদেশ থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দুই পক্ষকেই বাংলাভাষায় কথা বলতে শুনেছে। আগে শুধু টেলিগ্রাম নামের অ্যাপে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির তৎপরতা থাকলেও এখন তারা হুপ ও ট্যামট্যাম নামের অ্যাপে চ্যানেল চালু করেছে। এগুলো পরিচালনা করছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির মিডিয়া উইংয়ের লোকজন। তারা নিজেদের তৈরি কনটেন্ট কিংবা বিদেশি ভাষা থেকে অনুবাদ করে বিভিন্ন কনটেন্ট আপলোড করছে। কার কী প্রতিক্রিয়া দেখে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করছে। কাউকে কাউকে দলভুক্ত করছে।

জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি প্রচারের জন্য বেছে নিচ্ছে জনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো। সিটিটিসির দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বলেন, তারা আনসার আল ইসলামের ১০০টি প্রচারপত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তার ৩০ ভাগ পশ্চিমি ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানবিরোধী। ২৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরোধী। এছাড়া দুর্নীতি, আইনের প্রয়োগহীনতা বা অপপ্রয়োগ নিয়ে ২৫ ভাগ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুলমানদের ওপর কথিত নির্যাতন সংক্রান্ত আর জিহাদ ও ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনা আছে মাত্র ২০ ভাগ প্রচারপত্রে।

দল ভারী করতে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি এমন বিষয়গুলিকে বেছে নিচ্ছে, যেগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত। তারা গণতন্ত্রকে ‘কুফরি (ইসলামবিরোধী)’ বলে মনে করে এবং সরকারের নানা নেতিবাচক দিক তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকে। মহামারীতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়েও তারা আলোচনা করছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের যেসব তরুণ যুবক আইএসে যোগ দিতে দেশ ছেড়েছিল, তাদের অনেকে মারা গেছে। তবে অনেকেই ইরাক, সিরিয়া ছেড়ে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে। পুলিশ বলছে, বন্ধুপ্রতিম গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করছে। দেশেও কারও কারও যোগাযোগ আছে। তবে তারা নজরদারিতেই রয়েছে। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানে হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের জঙ্গিদের যোগাযোগ ছিল। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের জবানবন্দিতে এর উল্লেখ আছে।

তবে বাংলাদেশে কোথাও কোথাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলির মধ্যে সমন্বয়হীনতা জঙ্গিবাদকে উসকে দিতে পারে বলে আশঙ্কা আছে, একথা মনে করেন অনেকে। কাকে জঙ্গি বলা হবে, কাকে বলা হবে না, তা নিয়েও বাহিনীগুলির মধ্যে বিরোধ আছে। যেমন আল্লাহর দলের বেশ কয়েকজন সদস্য সাম্প্রতিক সময়ে গ্রেপ্তার হয়। তাদের অনেকেই দলটি নিষিদ্ধ হওয়ার আগে সদস্য ছিল। এরপরও গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে বাহিনীগুলির মধ্যে বিতর্ক আছে। অনেকেই মনে করেন, এতে করে খেপিয়ে তোলা হচ্ছে ধর্মান্ধ মুসলমানদের একটি অংশকে।

তারপরও হোলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার তদন্ত সংস্থা সিটিটিসির প্রধান মনিরুল ইসলাম বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশে ভূখণ্ড দখলের মতো অবস্থান নিতে জঙ্গিরা কখনোই সক্ষম হবে না। হামলাগুলি চালাচ্ছে মূলত কট্টর সুন্নিদের একাংশ। বাংলাদেশ ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ। তাদের মধ্যে শিয়াদের উপস্থিতি খুবই সামান্য। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জঙ্গিদের অনুকূলে নেই। ■

দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের এখন মূল টার্গেট শ্যামাপ্রসাদ

অভিমন্যু গুহ

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে ফেসবুকে কিছু মানুষের বদান্যতায় আচমকাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র উদয় হলেন, মানে নেতাজী-ভারতকেশরী তথাকথিত বিরোধ। যাদের এতকাল বাঙ্গালির দুঃখে অশ্রু বিগলিত হচ্ছিল এবং যাদের রাজনৈতিক উত্তরসূরিরা এককালে নেতাজীকে 'তেজের কুকুর' বলে আখ্যায়িত করেছিল, তাদের মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্রেসি'তে তাকে বামন হিসেবে দেখিয়ে দৈত্যাকার জাপানিদের হাত ধরে পথ হাঁটছেন নেতাজী ইত্যাকার নানা ধরনের অবমাননাকর কার্টুনে তাঁকে অসম্মানিত করেছিল, তাদের রাজনৈতিক পূর্বসূরিদেরও দেখা গেল নেতাজী-প্রেমে 'জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা' হতে।

আগেও আমরা বহুবার বলেছি, এই দুই পক্ষ আপাতভাবে রাজনৈতিক বিরোধী হলেও তাদের শিক্ষাদীক্ষাটা মোটামুটি এক। কেবল তফাতটুকু এই যে, এক পক্ষ সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে থেকে ভারতীয় গণতন্ত্রে ঘুণ ধরাতে চায়, অপরপক্ষ এতকাল সংসদীয় ব্যবস্থায় অনাস্থাকারীরা, বর্তমান রাজ্যপাটে বুঝেছে রাজ্যের শাসক দলে নাম না লেখালে তাদের মৌরসিপাট্টা মাথায় উঠবে। গত পৌনে চার বছরের মধ্যে একটি অধুনা নকশাল সংবাদপত্রের সরকার বিরোধিতার কারণে দু'দুবার সম্পাদক বদল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বরং সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনাস্থাকারীরা (যাদের আমরা নকশাল বলে চিনি) ভেবে দেখেছে মুখ্যমন্ত্রীর তাঁবে থাকলে তাদের দেশবিরোধী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা সমর্থ হবে।

কলকাতায় বামপন্থীদের হাতে কালিমালিপ্ত শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের ইতিহাসের কুনকে (পরিমাপক যন্ত্র) হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কথা, সেখানে তাদের রচিত ইতিহাসকে মূলধারার ইতিহাস বলে স্বীকৃতি দিলে দেশের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এই পরিস্থিতি মোদী সরকার সার্বিকভাবে পালটাতে সমর্থন হয়েছে, তাই এই ত্রাহি ত্রাহি রব।

নেতাজী-ভারতকেশরীর যে সংঘাত , তা আদর্শগত ছিল না। মূলত তাঁদের দুই দল অনুগামীর মধ্যে লড়াইটা বেঁধেছিল, তা শারীরিক সংঘাতের আকার পর্যন্ত নেয়। সমকালীন কাগজের রিপোর্ট দেখলে, বলরাম মাধোকের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী পড়লে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। এইসব ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে কিন্তু এই অপপ্রচারের মোকাবিলা করা যাবে না। এদের ভেক সম্বন্ধে আমরা বারবার সমাজকে সতর্ক করে আসছি, এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো এদের দেশবিরোধী মুখের আড়ালে মুখোশের সঙ্গেও আমাদের সুপরিচিত হতে হবে, নইলে কিন্তু সমূহ বিপদ।

এদের জন্য '৪৭-এ দেশভাগ হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে জওহরলাল নেহরুকে সামনে রেখে এরা একের পর এক ঘটনায়

দেশের প্রতিরক্ষা, অর্থ, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে। এরা আন্তর্জাতিকতার নামে চিরদিন ভারতীয়দের দেশপ্রেম থেকে বঞ্চিত করবার ষড়যন্ত্র করে এসেছে। এদের রাজনৈতিক উত্তরসূরিরা কিন্তু আজও আছে, কেবল তাদের মুখোশের জন্য আমাদের চিনতে অসুবিধে হচ্ছে।

এতকাল দিব্যি চলছিল, গোল বাঁধলো ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ ক্ষমতায় আসার পরেই। এই সরকারের প্রথম থেকেই কর্মসূচি ছিল মানুষের মনে দেশপ্রেমের ভাব উদ্দীপিত করা, বিশ্বের সামনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের চেহারাটা তুলে ধরা। জওহরলাল নেহরুর আমল থেকে যে দুর্বল, সন্ত্রাস কবলিত, অভ্যন্তরীণ সমস্যা-দীর্ণ ভারতের ছবিটা ছিল, তাকে পালটে দেওয়া। এতকাল পেট্রোডলারের উপস্বত্বভোগীরা এবার দেখলো চরম বিপদ। আন্তর্জাতিক কমিউনিজমকে যেমন মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগে টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া তাকে বেআব্রু করে দিয়েছে, কমিউনিস্ট চীনের যেমন সাম্রাজ্যবাদী, ক্যাপিটালিস্ট রূপটা যেমন নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, এও তেমনি ভারতীয় জনগণের দেশপ্রেমের অভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। দেশপ্রেম সঞ্চারিত হতেই ভক্ত, অন্ধ ভক্ত, চাড্ডি ইত্যাদি নানান টার্মিনোলোজি আবিষ্কার হতে লাগলো আর প্রয়োজন পড়তে লাগলো মুখোশের। মোদী সরকার তাদের অস্তিত্বের মূলে কুঠারঘাত করতে চাইলো। এতকালের দেশবিরোধিতা, দেশের পরে দেশের খেয়ে দেশের দাড়ি ওপড়ানোর প্রচেষ্টায় আঘাত আসতেই দেশ-বিরোধিতার নজর আড়াল করতে শুরু হলো বিজেপি বিরোধিতা, মোদী বিরোধিতা। বিজেপি বিরোধিতা আর দেশ বিরোধিতা এক নয় বলে চিল চিৎকারে গগন বিদীর্ণ করা হলো। কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হলেন। বিজেপি-বিরোধিতা আর দেশ-বিরোধিতা এক নয় ঠিকই, কিন্তু আজ এটা প্রমাণ করবার সময় এসেছে বিজেপি বিরোধিতাটা আসলে মুখোশ, আসল লক্ষ্য সেই দেশ-বিরোধিতা। ভাবতে অবাক লাগে, যারা এককালে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'ভুলতে পারি বাপের নাম, ভুলবো নাকো ভিয়েতনাম' স্লোগানে আকাশ-বাতাস মথিত করেছিল এবং আজও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সেই স্লোগান ওঠাবার, তারাই হঠাৎ করে 'আন্তর্জাতিক' থেকে কোন মন্ত্রবলে প্রবল আঞ্চলিক সংকীর্ণতা দুষ্ট হয়ে যান। আজ যারা বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট নিয়ে আসরে নেমেছে, খুব ভালো ভাবে তাদের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও তো বাঙ্গালি, তাঁর প্রতি তবে কেন এত বিদ্বেষ? কারণ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশভাগ পরবর্তী পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দূরদর্শী পদক্ষেপে বাঙ্গালি হিন্দু খেয়ে-পরে বাঁচার অধিকারটুকু অন্তত পেয়েছিল।

২০ জুন নিয়ম করে পশ্চিমবঙ্গবাসী তাদের নিজভূমি ফিরে পাওয়ার দিনটি উদযাপন করেন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে। বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের খবরে এখন সারা দেশ গর্জে ওঠে। 'সিটিজেনস আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশি হিন্দুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর হত্যাকারীদের বংশধরদের তো এতে গায়ে লাগবেই। এতদিনের মৌরসিপাট্টা, রাজ্যপাট যে এতে করে চুরমার হয়ে যাওয়ার জোগাড়। সেই রাগের প্রতিফলনেরই আমরা সাক্ষ্য হলাম তাঁর জন্মদিনের দিন।

এই প্রবণতা বরাবরই ছিল। এখন আরও প্রকট হয়েছে মাত্র। দুই বাঙ্গলা এক হও এই ধুয়ো তোলা, যাতে করে দীর্ঘদিনের সাধ ইসলামিস্তানের আশা পূরণ করা যায়, শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়, কিরণশঙ্কর মৈত্র, শরৎচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক ভুলকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। শুধুমাত্র যৌনখিদে মেটাতে ইসলাম গ্রহণ করা, এক গায়ক কয়েক বছর আগে বলেছিলেন, ওসব রবীন্দ্র-নজরুল পড়ে কিস্যু হবে না, তার থেকে মহম্মদ শহীদুল্লাহ পড়ুন। এই শহীদুল্লাহ একজন প্রবল সাম্প্রদায়িক উর্দুপন্থী লোক, যাকে আজ বীর বাঙ্গালি সাজাবার চক্রান্ত চলছে। মাঝেমধ্যেই গুজ্জু নাম দিয়ে গুজরাতিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, ক্ষোভ উসকে দেবার ষড়যন্ত্র চলে, এতেও মোদীর দোষ; কারণ তিনি গুজরাটি। মজার ব্যাপার হলো, গান্ধীজীও গুজরাটি, তাঁর হত্যার জন্য আরএসএস-কে না দুষলে যাদের ভাত হজম হয় না। গান্ধী-হত্যায় আরএসএস-সংযোগের ন্যূনতম প্রমাণও যেখানে দাখিল হয়নি, আদালতের রায় যেখানে আরএসএসকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলেছে, আরএসএস-ফোবিকরা তবুও এই মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যান গোয়েবলসীয় নীতি মেনে, একই মিথ্যে হাজারবার বললে তা এক সময় সত্য হয়ে যায়।

এরাই একদিন বাঙ্গালি ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারকে তাড়িয়েছিল। তার পরিবর্তে ইসলামিস্তানের সমর্থক কিছু কমিউনিস্ট পার্টি ক্যাডারকে যেমন ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্রদের ইতিহাসবিদ বানিয়েছিল। তাদেরই অপকীর্তি দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট ইতিহাসকে ভারতের মূলধারার ইতিহাস বলে চালানোর, দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে কমিউনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতাকে ভুলিয়ে দেবার, দেশের মনীষীদের অপমান করার, উপরন্তু নিজেদের অপকীর্তি ঢাকার জন্য দেশভক্ত আরএসএস-কে, দেশপ্রেমী সাভারকরকে ব্রিটিশদের চর হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের ইতিহাসের কুনকে (পরিমাপক যন্ত্র) হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কথা, সেখানে তাদের রচিত ইতিহাসকে মূলধারার ইতিহাস বলে স্বীকৃতি দিলে দেশের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এই পরিস্থিতি মোদী সরকার সার্বিকভাবে পালটাতে সমর্থন হয়েছে, তাই এই ত্রাহি ত্রাহি রব।

জওহরলাল নেহরু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে। স্বাধীনতার তখনও পুরো পাঁচ বছর পূর্ণ হয়নি। সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত তারাশঙ্করের বয়স তখন চুয়ান্ন বছর প্রায়। তখন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংস্কৃতি শাখার সভাপতি। স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জওহরলাল নেহরুকে কেমন দেখেছিলেন, কী প্রত্যাশা করেছিলেন নেহরুর কাছ থেকে এবং তাঁর সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছিল— সেসব কথা আলোচনার আগে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে মাঝখানের এই পাঁচটি বছরে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী সাহিত্যিক হিসেবে প্রাপ্ত-স্বাধীনতা সম্পর্কে তারাশঙ্করের মন ও মানসিকতার কিছু পরিচয় জেনে নেওয়া দরকার।

জীবনের শুরু থেকে অর্ধশতাব্দীকাল পরাধীন ভারতীয় তারাশঙ্কর স্বাধীনতার জন্যই স্বদেশি আন্দোলনে নেমেছিলেন। কারাবাস করেছিলেন এবং সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা পেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল পনেরো আগস্ট রাত্রি অবসানের প্রভাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তুলে সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে হৃদযন্ত্র থেমে যায় তথাপি আনন্দের আতিশয্যে পৃথিবীর আদ্যন্ত কালের মধ্যে তাঁর থেকে সুখী ও ভাগ্যবান আর কেউ থাকবে না। একথা যেমন সত্য তেমনি একই সঙ্গে এও সত্য যে, প্রাপ্ত স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি হতাশও হয়েছিলেন অপরিসীম। সাহিত্যের পথে পা দিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'— রচনাগুলির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধের যে রূপ ও মহিমাকে প্রকাশ করেছিলেন, যে জীবনযুদ্ধের জয়কামনার স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন প্রাপ্ত স্বাধীনতায় তার

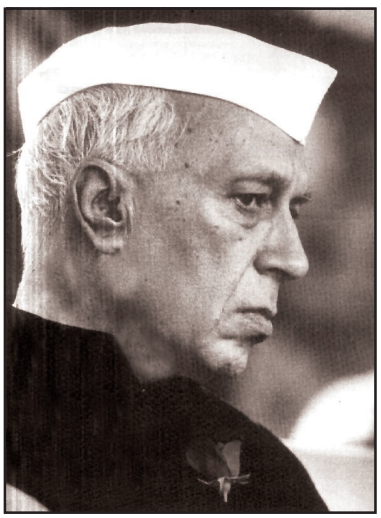

অপ্রাপ্তিজনিত আক্ষেপ তাঁকে হতাশ করেছিল। সেই হতাশার জন্য দায়ী করেছিলেন দেশনায়কদের। স্বাধীনতার পরে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তারাশঙ্করকে এমন আক্ষেপের কথা প্রথম প্রকাশ করতে শোনা যায়। সাহিত্য শাখার অভিভাষণে তিনি বলেন (১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত) —

''ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের নাগপাশের বন্ধন-বেদনার মধ্যে বাঙ্গালির জীবন এবং সাহিত্য মুক্তিসাধনায় সবল দেহ এবং পবিত্র আত্মার মতো জাগ্রত হয়েছিল। ঐতিহাসিক বিচারে সেইকালে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সে যাত্রা তার একক যাত্রা। অন্ধকার রাত্রে দুর্গম পথে বুকের পাঁজরে মশাল জ্বালিয়ে একাকী পথিকের যাত্রার সঙ্গেই তার একমাত্র তুলনা হয়। বঙ্গিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতেই হয়েছিল ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন। 'আনন্দমঠে'র কল্পনাই হলো পরবর্তীকালে বাংলাদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ভূমিকালিপি। জাতীয় জীবনের মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। তার মাতৃচরিত্র আনন্দময়ীর পরিকল্পনার মধ্যেই দেশমাতৃকা মন্দিরের বেদি থেকে অবতরণ করে গৃহাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছেন--- জননী ও জন্মভূমি এক হয়ে উঠেছেন, দেশের সব মানুষই হয়েছে স্বাধীন দেশের সমান অংশীদার। ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়--- হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান একজাতিত্বের সত্যকে উপলব্ধি করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সাধনায় বাংলা

সাহিত্য- নায়কেরা যে আদর্শকে আমাদের মনোজগতে রূপায়িত করেছেন, সে আদর্শকে দেশের কর্ম নায়কেরা বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হন নাই বলেই পরাধীনতা মুক্তির শুভলগ্নে আজ ক্ষোভ ও আক্রোশ হতে উদ্ভূত দুই জাতিতত্ত্বের ভ্রান্ত উপলব্ধিকে সত্যের মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষ। তাই ভারতবর্ষ আজ দ্বিধাবিভক্ত।"

দেশভাগের জন্য তারাশঙ্কর সেদিন দেশের কর্মনায়কদের সংকীর্ণতার কথায় সরব হয়েছিলেন। দেশের ওইসব অন্যান্য কর্মনায়কদের মধ্যে জওহরলাল নেহরুও যে ছিলেন সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পরে নেহরুজীর সামনেও সে কথায় সোচ্চার হতে দ্বিধান্বিত হননি তারাশঙ্কর। 'তাঁরা' যে ভারতসাধক বাঙ্গালি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত-ভাবনার দিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি সেই কথাটিই সেদিন থেকেই বোম্বাই প্রাবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তুলে ধরেছিলেন আর এক ভারত-সাধক বাঙ্গালি এই কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের এই কথা পড়ার পর দেশভাগের ইতিহাস অনুসন্ধানে

নবকৌতূহল উদ্রিক্ত হয় আমাদের মনে। মনে করি দেশ বিভাগের অন্তরালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চরম পরাভবের ইতিহাস এবং দেশনায়কদের এক চূড়ান্ত ব্যর্থতার সত্য কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে তারাশঙ্কর প্রদত্ত ওই ভাষণে।

২

বোম্বাই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের সময় জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তারাশঙ্করের আলাপ ছিল না, এমনকী তখনও পর্যন্ত নেহরুজীকে কাছ থেকে দেখারও সুযোগ তাঁর হয়নি। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তারাঙ্করের প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে কলকাতার লেক ময়দানে, রবীন্দ্র সরোবরের পাশের মাঠে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জওহরলাল নেহরু-সহ কংগ্রেসের অন্য সম্মাননীয় সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই প্যান্ডেলেই একটি সংস্কৃতি সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংস্কৃতি শাখার সভাপতি তারাশঙ্করই সেই সংস্কৃতি সম্মেলনেরও সভাপতি ছিলেন। সেদিন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম আলাপ হয়। স্মরণীয় যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি দর্শনে তারাশঙ্কর যতটা আনন্দ অনুভব করেছিলেন, সংস্কৃতিমঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন জাতীয় সাহিত্যিক হিসেবে দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে ততটা মধুর ভাষণে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পারেননি, বরং মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর আক্ষেপভরে নেহরুজীর সমালোচনামূলক অভিভাষণ দিয়েছিলেন।

এআইসিসি-র অধিবেশন বসবে সকাল সাতটায়। অনুষ্ঠানের দিন ভোরে বেরিয়ে লেক ময়দানে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তাঁর সঙ্গে আরও অনেককে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ তারাশঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপের আবেগ -আনন্দ-শিহরণে আগের দিন সারারাত্রি ঘুমাননি তিনি। সেই দিনের রোমাঞ্চময় অনুভূতির স্মৃতিচারণায় তারাশঙ্কর বলেছেন—

''সে আমার জীবনে এক রোমাঞ্চকর প্রত্যাশার দিন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নেতা— সকল ভরসার একমাত্র প্রতীক। মহাত্মাজী মহাপ্রয়াণ করেছেন, সুভাষচন্দ্র উদ্দেশহীন। তাছাড়া ১৯৫২ সালে নেহরু মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের মতো ভাস্বর। সারারাত্রি আমার ঘুম হয়নি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হব আমি।''

অতুল্য ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তাঁবুতে তারাশঙ্করকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারাশঙ্কর দেখেছিলেন, তাঁবুর মধ্যে দুধের মতো সাদা চাদর তাকিয়ায় সাজানো প্রশস্ত আসর। তার পূর্ব দিকের সারিতে ঠিক মধ্যস্থলে বসেছিলেন প্রদীপ্ত মুখ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সর্বাঙ্গে দুধের মতো সাদা খদ্দরের শেরওয়ানি চুস্ত পায়জামা, মাথায় খদ্দরের গান্ধী-টুপি। পাশেই বসেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দু'জনে কথা বলছিলেন। অতুল্যবাবু তারাশঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন। বিধান রায় দেখলেন এবং জওহরলালকে কিছু বললেন। 'জওহরলাল ফিরে তাকালেন। প্রসন্ন স্মিত হাসি ছিল তাঁর মুখে'।

সাংস্কৃতিক সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তিনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তারাশঙ্কর একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। তারাশঙ্করের মতে ''অভিভাষণটি আমার জীবনের একটি মূল্যবান রচনা (আমার দিক থেকে)। কারণ তার মধ্যে যে কথা আমি বলেছিলাম, তাই আমার জীবনের কথা''। সেই অভিভাষণের মর্মকথা তারাশঙ্করের ভাষাতেই তুলে ধরা হলো :

''স্বাধীন ভারতবর্ষেও আজ— ভারতবর্ষে সংস্কৃতি ও সাধনার যে ধারাটিকে শাশ্বত ও সনাতন বলে মনে করি, যে ধারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এবং গান্ধীজীর কর্মযোগে পরাধীনতার মধ্যেও তাঁদের সাধনাবল নূতন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশ-দেশান্তরের জীবনদর্শনের উপর যার দীপ্তিতে প্রশ্নচিহ্ন জেগেছে সেই সংস্কৃতি ও সাধনা আজ আমাদের দেশের একদল বৈদেশিক মতবাদ ও জীবন-দর্শন প্রভাবিত মানুষের উগ্র আক্রমণে বিপন্ন। তাঁরা তাকে নিষ্প্রভ করবার চেষ্টা করছেন এবং তার উপর ক্লেদ ও কলঙ্ক নিক্ষেপেও দ্বিধা করছেন না।''

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'নববর্ষ' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ওই ভাষণেই তারাশঙ্কর বলেছেন, 'ভারতবর্ষের জয় হইবে'। যে ভারত প্রাচীন, যা প্রাচীন, যা প্রচ্ছন্ন, যা বৃহৎ, যা উদার, যা নির্বাক তার জয় হবে। সমস্ত মিথ্যাচারিতা ও আস্ফালন উপেক্ষা করে ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পেতে যোগ্য পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষায় থাকবে— মন্ত্রদানের প্রতীক্ষায়। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চবার্ষিকীর পরও সে সময় উপস্থিত হয়নি। তিনি বলেছেন—

এ প্রত্যাশা আজও ব্যর্থ হতে চলেছে। সেইখানেই স্বাধীন ভারতবর্ষে এসেছে সংস্কৃতির সংকট। ইংরেজ শাসনের সময় পরাধীনতার যে খাদ কেটেছিল সেই খাদের মধ্য দিয়ে এসেছিল ইউরোপীয় জীবন দর্শন ও মতবাদের লবণাক্ত প্রবাহ। স্বাধীনতা অর্জন করে সে খাদ যখন বন্ধ করবার কথা তখনই এই বিদেশি সংস্কৃতি ও মতবাদ-মোহান্ধ একদল সেই খাদকে প্রশস্ততর করবার উদ্যোগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। যেখানে যেখানে সাংস্কৃতিক বেদিগুলি ছিল বা আছে তারই উপর তাঁরা প্রবল উদ্যমে মাটি খোঁড়ার যন্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাকে গহ্বরে পরিণত করবার চেষ্টা করেছেন। ভারত-সংস্কৃতির যে পুনরুজ্জীবন আমরা প্রত্যাশা করে এসেছি পিতৃ-পিতামহ-ক্রমে তা বিনষ্টির সম্মুখীন হয়েছে।

মানুষের বাইরের রূপে এবং অন্তরের গঠনের যে বিচিত্র রূপ তারাশঙ্কর দেখেছিলেন তা 'অভারতীয় বলেই অসৎ নয়, অসৎ বলেই অভারতীয়' বলে মনে হয়েছিল তাঁর। স্বাধীন ভারতবর্ষে তার পরিবর্তন দেখতে চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর কিন্তু আশাহত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, বাঙ্গলা কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ প্রমুখের সামনেই তারাশঙ্কর তাঁর আক্ষেপ ও হতাশার কথা প্রকাশ করেছিলেন নিঃসংকোচে। স্মরণীয় যে সেই দিনই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রথম বক্তব্য পেশ। কিন্তু বড়ো বিস্ময়ের বিষয় সেই প্রথম আলাপের দিনই স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর হতাশার কথা তুলে ধরতে ভয়ে ভীত হননি, এমনকী দ্বিধাবোধও করেননি। জাতীয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন সঙ্কোচহীন সত্য ভাষণের কথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর আশা ও হতাশা— ভারতবর্ষে

বাস্তবতাবোধে সার্থক বা উজ্জ্বল এবং গৌরবান্বিত সুমহৎ বা মহত্তম আদর্শ সৃষ্টির ক্ষেত্রে। এই উজ্জ্বল ও মহান আদর্শকে সম্মুখে রেখেই সেই সংস্কৃতিধারা বহু বিপর্যয় বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে সেখানে পৌঁছুবার চেষ্টা করে এসেছে— ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। স্বাধীনতা হারিয়েও সে এই আদর্শকে হারায়নি। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আদর্শময় আশার আলোকবর্তিকা স্বাধীনতার পর ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তিনি আশা করেছিলেন—

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পর গান্ধীজী নেতাজী এবং জওহরলাল প্রভৃতির নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা এল, প্রত্যাশা করেছিলাম তার মধ্য এই আদর্শে মানসসরোবরে শীতের জমাট জল বিগলিত হওয়ার মতো নবপ্লাবনে ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে দেবে। এবং বিশ্বজগতের সংস্কৃতি সমুদ্রে প্রবল ধারায় নেমে এসে যে সঙ্গমতীর্থের সৃষ্টি করবে তাতে অভিশপ্ত সগর সন্তানের মতো পৃথিবীর মানুষ উদ্ধার পাবে। হিংসাদ্বেষ তামসিকতা রাজসিকতা থেকে একটি প্রসন্ন শান্তিময় সাত্ত্বিক জগতের সৃষ্টি সম্ভব করবে।

তিনি মনে করেননি যে লক্ষ লক্ষ বিধবার দীর্ঘশ্বাসে সমাজ উত্তপ্ত হবে, মনে করেছিলেন রামগত-প্রাণা সীতার মতো নারী আদর্শ সুলভ হয়ে উঠবে, যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদীর আবির্ভাবে ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীতে এক মহান আদর্শ সৃষ্টি করবে। কল্পনা করেননি— প্রচলিত সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বিধানকে মাথায় করে ধনীপ্রাধান্য ও প্রভাব প্রভাবিত সমাজ কায়েম থাকবে। কল্পনা করেছিলেন একটি অমিত শক্তিতে শক্তিশালী জাতি— সাম্যে প্রতিষ্ঠিত এবং অহিংসায় নম্র ও উদারতার পথে অগ্রসর হবে। মানুষ হবে ভারতের প্রাচীন আদর্শে সত্যবাদী সৎ-সতী এবং ধর্মনিষ্ঠ। সে ধর্ম আচারসর্বস্ব নয়, সে ধর্ম বিচারপ্রধান সার্বজনীন। কিন্তু সে আশায় তিনি আশাহত হয়েছিলেন। ইংলন্ডের যুদ্ধকালের ত্রাণকর্তা— তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের একটি কথা স্মরণে এসেছিল তাঁর। যে কথা চার্চিল তৎকালীন ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের এবং পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেছিলেন—

"But these sources are not enough; something must be found to replace religion as a binding force and director. All his life he has suffered under a handicap, which is that he is shy of using... the name of God, yet cannot find any proper substitute. Therefore he must invent the life force, must twist the Savior into a half-hearted socialist, and establish Heaven in his political image.

চার্চিলের সেই কথা উদ্ধৃত করে তারাশঙ্করের প্রশ্ন ছিল— 'আমাদের দেশেও কি তাই ঘটেনি?' রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি, ঋষি এবং সর্বোত্তম ভারত-বিবেক জেনেও তাঁর তিরোধানের পরই ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের বিশেষ করে সাহিত্য জগতের চিন্তানায়কদের সম্পর্কে এই কথাটাই সত্য নয় কি! ঈশ্বরবিশ্বাসী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভারত- সংস্কৃতি ও ভারত-ধর্মের অক্ষয় অমৃতকুম্ভ জীবনব্যাপী তপস্যায় পুনরুদ্ধার করে তুলেছিলেন। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অমৃতকুম্ভের আধেয় থেকে ঈশ্বর-মাহাত্ম্য অংশটুকু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিঃশেষে ছেঁকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়নি বা হচ্ছে না কি? স্বাধীনতার পর এদিকে সংবিৎ ফিরবে এই প্রত্যাশা তারাশঙ্করের ছিল— কিন্তু তাতে আশাহত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালের মার্চমাসে জওহরলাল নেহরুর সামনে তারাশঙ্কর প্রদত্ত এই ভাষণ বাঙ্গলা তথা ভারত সংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় মুহূর্ত বলে মনে করতে হয়। সেদিন তারাশঙ্কর যেমন সত্যপ্রকাশের সাহস দেখাতে পেরেছিলেন তেমনই নেহরুও ধৈর্যধরে তা শুনেছিলেন। বর্তমানে সেই সাহস ও ধৈর্যের চরম সংকটকাল চলছে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

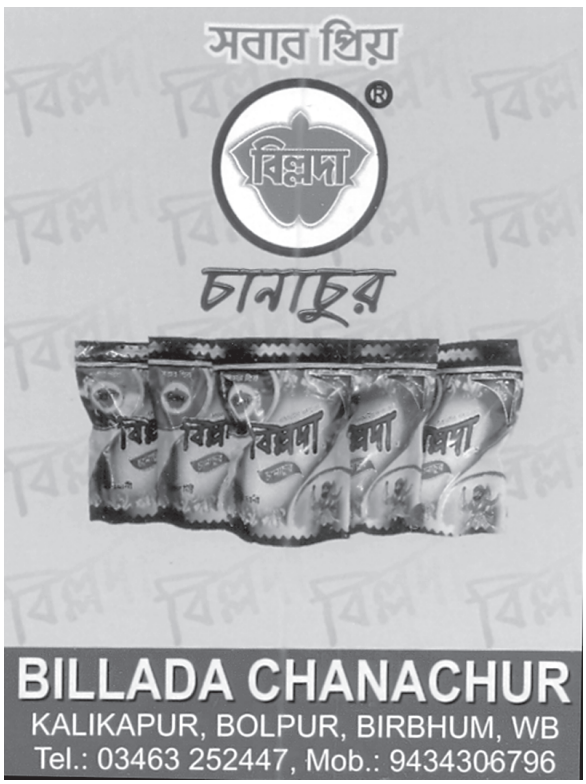

পুঞ্জীভূত ধার মেটানোর মানসচর্চা থেকেই স্বদেশী জাগরণ করতে হবে

জীবনের সব ক্ষেত্রে সম্পদের পুনর্ব্যবহার করার মধ্যেই সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষ নির্মাণ করা সম্ভব। বৃষ্টির জল, সূর্যালোক, ফসলের খড়নাড়া-কুটিপাতি কোনো কিছুই ফেলনা নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও বর্জ্য পদার্থকে সম্পদ করে তোলার মধ্যে আত্মনির্ভরতা কাজ করে। দেশীয় জিনিস দিয়েই আমাদের রোজকার জীবন চালানোর অভ্যাস করতে হবে।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

স্বদেশ কাকে বলে, রাষ্ট্রের ধারণা কী, শিকড়-সংস্কৃতি কী— সেটাকে ভুলিয়ে দেবার এক বহুমুখী প্রচেষ্টার বহু ব্যাপকতার নামও গ্লোবালাইজেশন। বিশ্বায়নের মধ্যে যদি কেবল সামগ্রীর ব্যবহারখানি থাকতো, বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবহারটুকু গৃহীত হতো, প্রয়োজনীয় জিনিসটির আমদানিটুকু থাকতো তবে স্বাদেশিকতার সমস্যা, স্বাবলম্বনে পুনর্ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন সমস্যাটি এতটা গভীর ও জটিল হতো না। কিন্তু ইদানীংকালে তাই অনুভূত হচ্ছে। সমস্যার মূল কারণ হলো বিদেশি তাত্ত্বিকতা। বিদেশি তত্ত্ব, বিলাতের শিক্ষা উত্তম, পশ্চিমের তাত্ত্বিকতা, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ভারতে প্রয়োগে সামূহিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, 'ইজম'-কে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে, ভারতের ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতির যাবতীয় মাটি চেঁছে তাতে বিদেশি তাত্ত্বিকতার পিলার বসিয়ে তবে অট্টালিকা নির্মাণ করতে হবে, রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে আন্তর্জাতিকতার এলাহি আয়োজন করতে হবে— তা থেকেই তৈরি হয়েছে পরনির্ভরতার যাবতীয় সমস্যা। বিদেশি বিচারধারার প্রচার ও প্রসারে রাজনৈতিক সংকল্প ও ব্যাপকতা বিষয়টিকে বহু জটিল করে তুলেছে। দেশে অনেক মানুষের মধ্যে স্বদেশী ভাবনা নেই, সংস্কৃতির সংরক্ষণ নেই, অথচ আন্তর্জাতিকতার মানস-সিংহাসন মজবুত। কোথায় স্বাবলম্বনের বেড়া দিতে হয়, কোথায় দেশরক্ষার জন্য আত্মবলিদান করতে হয়, তার নির্দেশ নেই যে মতাদর্শে, যে মস্তিষ্কে, যে চেতনা-প্রবাহে— তার ভরকেন্দ্র ভারতবর্ষ নয়, হতে পারে ভারতবর্ষের বাইরের কোনো গুপ্তদেশে, বিদেশি শক্তির মন্ত্রগুপ্তির শপথে। তাদের সঙ্গে দেশব্রতী মানুষের বিচার ধারার মূল পার্থক্য হলো এইরকম— রাষ্ট্রবাদী মানুষ মনে করেন, 'আগে দিয়ে বেড়া/ তবে ধরো গাছের গোড়া।' দেশকে আত্মনির্ভরতা দিয়ে, অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিয়ে প্রতিটি জীবনবৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই রাষ্ট্রীয় বেড়া দিতে হবে। বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে ভারতীয় সামগ্রীর উৎপাদন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির নতুন নামকরণ হোক স্বদেশী জাগরণে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী জাগরণের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। প্রথম আয়োজনটি হওয়া উচিত পুঞ্জীভূত মানসিক ধার মেটানোর কার্যক্রম; এতদিনের মানসিক ঋণের বোঝা দূর হোক। স্বদেশী ঘরানার মানসচর্চা কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত বিস্তৃত, কোথায় তার নানান সমৃদ্ধি, কোথায় তার বিকাশ ও সম্ভাবনা— তার সুলুকসন্ধান করার নিত্যকর্ম হবে জাগরণের পূজারি ও প্রচারকদের আশু কর্তব্য।

কিন্তু তাই বলে কি পাশ্চাত্যের প্রভাব খারাপ? কোথায় প্রাচ্য আর কোথায় পাশ্চাত্য খাপ খাবে, সে সম্পর্কে আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবাদী মানুষের বাইরে সেই জ্ঞানের দীনতা বরাবরই ছিল। কোথায় ভারতবর্ষ চিন্তায়-চেতনায়, সম্পদে-আয়োজনে ধনী, কোথায় আমাদের দারিদ্র্য, কোথায় আমাদের বিদেশি দইয়ের দম্বলটুকু নিয়ে ভারতে দই পাততে হবে, সে ধারণার যারপরনাই খামতি ছিল। আজ করোনা পরিস্থিতিতে সুযোগ এসেছে বিদেশি বিদায় করে স্বদেশী আহ্বানের কাজকে বাস্তবায়ন করা। এটাকে বলা যেতে পারে অকাল দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজার আয়োজন। অলক্ষ্মীকে দূর করে লক্ষ্মীকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করা। দেশীয় বিচারধারার ভিত্তিপ্রস্তর পাকা করার নামই হলো নবতর-স্বদেশী-জাগরণ।

আমরা অন্য দেশ, অপর জাতি থেকে সামগ্রী, সম্পদ ও জ্ঞানান্বেষণে আগ্রহী, উৎসাহী, কিন্তু তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিনে নিতে হবে আমাদের পুরাতনী ঐতিহ্যের আলোয়, বুঝতে হবে বর্তমানের প্রয়োজনানুসারে, ধরতে হবে তার সাযুজ্য। কারণ একটি প্রবাদ বাক্য হলো, 'এক গাছের ছাল আর অন্য গাছে জোড়ে না'। সিদ্ধান্ত নিতে হবে কতটুকু গ্রহণ করবো, আর কতটুকু বর্জন করবো। বিদেশের মোহ ও অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করার নাম স্বাদেশিকতা। আপন সামর্থ্যে, দেশীয় সৌকর্যে আপনার বাগানে ফুল ফোটান যিনি, তিনিই স্বদেশী। আপনার চিন্তা-চেতনায় আপন দেশের মাটি যার কাছে বহুগুণ পবিত্র তিনিই স্বদেশী।

বিদেশে বসবাস করেও ভারতের মানুষের মঙ্গলের জন্য সতত পরিকল্পনা করতে পারেন যিনি, সেই ত্যাগী মানুষকে স্বদেশীয় বলা চলে। যার মস্তিষ্কে, মননে, করসেবায় ভারতের তপস্যা তিনি ভারতীয়। ভারতে বসে ভারতরাষ্ট্রের ভিত যিনি প্রতিনিয়ত দুর্বল করার সিঁদ কাটেন তিনি বিদেশি। ভারতে বসবাস করে যার হেড কোয়ার্টার বিদেশের সিগনাল ক্যাচ করে তিনি অবশ্যই বিদেশি। দেশি-বিদেশিকে চিনতে পারার অন্য নাম স্বাদেশিকতা।

টুথপেস্ট, ব্রাশ, সাবান, নানান প্লাস্টিক সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র ইত্যাদি দিয়ে দেশের বহু মানুষের সকাল থেকে সন্ধ্যা কাটে। হয়তো ব্যবহারকারীরা জানেনই না যে জিনিসগুলি বিদেশি কোম্পানির তৈরি। হয়তো জিনিসগুলি যারা বিপণন করেন— দোকানদার মুদি, ফুটপাতে পসরা সাজিয়ে বসেছেন যিনি তারাও জানেন না, জিনিসগুলি ভারতীয় প্রোডাক্ট নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু জিনিস বিদেশি, অথচ যে জিনিস উৎপাদনের সক্ষমতা, বিপণনের সুযোগ ও সম্ভাবনা ভারতেই আছে, তবুও তা অঢেল বিকিকিনি হচ্ছে। ডাক দেওয়া হয়েছে স্বনির্ভর ভারত গড়ার, প্রচেষ্টা হচ্ছে স্বদেশী জাগরণের, তবে যে জিনিসটি দিয়ে শুরু করতে হবে তা হলো, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ব্যবহার-জনিত ধার মেটানোর মানসিকতা। দেশের সব মানুষকে জানতে হবে কোন প্রোডাক্ট, কোন কোম্পানির মালিকানা ভারতীয় নয়, কোন কোন বিদেশি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের নানাবিধ পণ্য সমগ্র ভারত জুড়ে ছড়িয়ে বসে আছে। জানতে হবে এই সামূহিক বেচা-কেনায় কত লক্ষ কোটি ভারতীয় মুদ্রা সেই বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো দেশে যদি ভারতীয় কোম্পানিগুলি সেই সব পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তবে এই দীর্ঘকালের বিদেশি নির্ভরতা কতটা কমবে, তারও একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা পাশাপাশি করা জরুরি।

আত্মনির্ভর-ভারত আন্দোলনের দুটি দিক— প্রথম বিদেশি বয়কট, পিকেটিং, প্রতীকী প্রতিবাদ-স্বরূপ একটি দুটি সামগ্রী পোড়ানো যা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল, দ্বিতীয় দিকটি হলো দেশীয় উৎপাদনের তোড়জোড় ও গবেষণা। দুটি আন্দোলনকেই যুগপৎ চালাতে হয়েছে ভারতবর্ষ-সহ নানান দেশে। বিদেশি জিনিস বয়কটের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো, সাধারণ মানুষ জানেন না, কী কী অতি সহজেই বয়কট করা সম্ভব, কী কী সামগ্রী দেশীয়ভাবে নির্মাণ করা যায়। আরও মনে রাখতে হবে, কোন পণ্য কোন উৎস সামগ্রী বা র-মেটেরিয়ালের উপর নির্ভরশীল যা বিদেশ থেকে আমদানি না করলে চলে না, খেয়াল রাখতে হবে আপাতত বিদেশ থেকে যা আমদানি না করেও চালিয়ে নেওয়া যায় সেই সমস্ত জিনিগুলি কী কী। আর একটি বিষয় হলো, কোনো কোনো দেশীয় কোম্পানির বিদেশি স্লিপিং পার্টনার থাকে, যারা প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত সহায়তা দেয়, তাদের কতটা বিদেশি কোম্পানি বলে ধরা হবে, তাদের সেই বিদেশি কারিগরি সম্পর্কটি কতটা বলবৎ রাখা সম্ভব, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এ সবই বিশ্লেষণ করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে ভারত-মনস্ক দেশীয় উদ্যোগপতিদের উদ্যম, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সততা। নানাবিধ উৎপাদনের জন্য দেশীয় উদ্যোগপতিদের এগিয়ে আসতে হবে। যে জিনস খুব সহজে, সুলভ প্রযুক্তিতে কম পুঁজি ব্যবহারে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরা গ্রামে, শহরের উপান্তে তৈরি করতে সক্ষম হবেন, তা দেশ জুড়ে তৈরি হোক।

স্বাবলম্বী ভারতের একটা বৃহৎ মানে হলো, ভারতের গ্রামগুলিকে যথাসম্ভব উৎপাদনে ও আয়োজনে, জীবনচর্যায় আগের মতোই সাবলম্বী করে তোলা, যেটা নেহরু জামানায় রুশ মডেলে আইটিআই ধাঁচের কিছু কারিগর বানিয়ে তাদের শিল্প কারখানায় পাঠিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের মানুষ আর কামারের বানানো জিনিস কিনলো না, কুমোরের তৈরি পাত্র দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগালো না, গ্রামের স্যাঁকরার ব্যবসা উঠে গেল, মুচি তার জুতো বানানো বন্ধ করে দিল। সবাই ছুটলো কলের জিনিস কিনতে, শহরের দোকানে বহুজাতিক কোম্পানির জুতোয় ছেয়ে গেল।

কৃষিপণ্য তো বটেই, গ্রামীণ জীবনচর্যার ও মানসচর্চার পরতে পরতে স্বাবলম্বন আনতে হবে। কৃষির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা মানে হলো বীজ, সার, কীটঘ্ন ও কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন। বীজ-নীতি এমন হওয়া উচিত, যাতে কৃষক চাষের কাজে নিজের বীজ নিজেই তৈরি করে নিতে পারে, কোনো বহুজাতিক বীজ কোম্পানিগুলির উপর অন্যায়ভাবে নির্ভর করতে না হয়। এতে বীজের খরচ যেমন কমে, তেমনই নির্দিষ্ট ফসল চাষ করিয়ি বা বীজ ব্যবহার করিয়ে কৃষককে পরিচালিত করার বহুজাতিক স্বার্থ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, কৃষক চাষ থেকে লাভবান হন। যে কৃষকের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব নয়, সরকারি খামারগুলি স্থানীয়ভাবে তাদের জন্য বীজ উৎপাদনের

ব্যবস্থা করবে। কোনো বীজ খামারকেই ফসলবিহীন পতিত করে রাখা চলবে না। প্রয়োজনে কৃষকের জমিতে পার্টিসিপেটরি সীড প্রোডাকশনের জন্য কৃষক, প্রজননবিদ ও সীড সার্টিফিকেশন আধিকারিকদের জুড়ে দিতে হবে। রাসায়নিক সারের জন্য প্রচুর বিদেশি নির্ভরতা আছে। জৈবিক চাষাবাদের মাধ্যমে রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে শূন্যে আনাটাই সবচাইতে বড়ো স্বাবলম্বন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জৈব সারের গুণগত মানের ক্ষেত্রে কৃষিজীবী মানুষ কোনো দুর্নীতি সহ্য করবেন না। সমন্বিত কীটশত্রু ব্যবস্থাপনা বা ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট করার মধ্যে যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক ব্যবহার বিধির আয়োজন রাখা যায়, তারই নাম স্বাবলম্বন। দেশীয় গোরু, বলদকে কৃষিকাজে সংযুক্ত করে তার গোবর-গোমূত্র ব্যবহার কারার মধ্যে যে কৃষি-আধার তার সামগ্রিকতা, তার নাম হচ্ছে স্বাবলম্বন। দেশীয় ধারায় জমির মাপ ও ফসল বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে দেশীয় কারিগরি দিয়ে সহজ-সরল-সুলভ যন্ত্রপাতি নির্মাণের নাম স্বাবলম্বন। আশা করি আগামীদিনে কৃষি গবেষক, প্রশাসক, আধিকারিকেরা এই স্বনির্ভর কৃষির দিকে ধাবিত হবেন। কৃষিজীবী মানুষের সন্তান যতক্ষণ না পর্যন্ত জমি, ফসল, প্রকৃতি ভালোবাসতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্বাবলম্বী ভাব আসবে না। আর এই ভাব আনতে হলে কৃষি ও কৃষককে শহরবাসী প্রবুদ্ধ মানুষের দ্বারা মান্যতা দিতে হবে। জীবনের সবচাইতে বড়ো শিল্প হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে দেশীয় উপায়ে কৃষিকাজে সবচেয়ে বেশি ও উৎকর্ষ মানের ফসল পাওয়া। গ্রামীণ যাবতীয় উৎপাদনের মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়াটা সবচাইতে বড়ো কাজ, এটা যে কোনো মূল্যে করতে হবে।

বহু সামগ্রী তৈরি হয় উদ্ভিজ্জ উৎপাদন থেকে। যেমন রিঠা, শিকাকই থেকে ভেষজ স্যাম্পু, নানান গাছগাছালি থেকে মশা নিরোধক ধূপ, চিরাচরিত ও অচিরাচরিত জৈব তন্তু দিয়ে নির্মিত বস্ত্র ও থলে। আগে কর্মশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে সাবান, ফিনাইল,

কালি, কাঠের হ্যাঙ্গার, ইত্যাদি তৈরি স্কুল স্তরেই শেখানো হতো। বানানো খুব কঠিন নয় সেগুলি। প্রয়োজনে তুলনামূলক ভাবে বড়ো উদ্যোগে, যৌথভাবে, স্বসহায়ক গোষ্ঠীর দ্বারা গ্রামে বা শহরে তার উৎপাদন সম্ভব, তাতে উদ্ভিজ্জ উপকরণ যথাসম্ভব ব্যবহার করা যায়। প্রসাধনী সামগ্রী বিদেশি কোম্পানির কেন কিনবো? নিজেরাই আগে তো বানাতাম আমরা, অনেক দেশীয় কোম্পানিও বানায়। ভেষজের ব্যবহার কেন বন্ধ হলো? কেন তা ব্যবহারে উদাসীনতা? বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলোকে সুবিধা করে দিতে অনেক অসাধু মানুষ দেশীয় গাছগাছড়াকে ব্রাত্য করে রেখেছে। জীবনের সব ক্ষেত্রে সম্পদের পুনর্ব্যবহার করার মধ্যেই সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষ নির্মাণ করা সম্ভব। বৃষ্টির জল, সূর্যালোক, ফসলের খড়নাড়া-কুটিপাতি কোনো কিছুই ফেলনা নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও বর্জ্য পদার্থকে সম্পদ করে তোলার মধ্যে আত্মনির্ভরতা কাজ করে। দেশীয় জিনিস দিয়েই আমাদের রোজকার জীবন চালানোর অভ্যাস করতে হবে। দেশীয় জিনিস হলো মায়ের দান, ভারত মায়ের অমূল্য রতন, মাতৃদুগ্ধ। অপচয় নয়, এই সম্পদকে বিচার বিশ্লেষণ করে দোহন করার নামই হলো স্বাদেশিকতা। বাঙ্গলার 'কান্তকবি' রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' দেশাত্মবোধক গানের কলিতে কলিতে স্বদেশি জাগরণের চৈতন্য হোক।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

চীনা সামগ্রী বর্জন

সম্প্রতি চীনা আগ্রাসনের পর তিন হাজার চীনা পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছেন ভারতীয় ব্যবসায়ী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল। ৫০০-র বেশি সামগ্রীর একটি সূচিও তৈরি হয়েছে। বর্তমানে চীন থেকে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি করা হয়, কী নেই তাতে। ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী থেকে আধা আলপিন, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল, চশমার কাঁচ, জুতো ইত্যাদি। একটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একটি বিখ্যাত জুতা তৈরির কারখানায় এক সময় ১৫০০০ লোক কাজ করতো। সেই কোম্পানি এখন চীনের তৈরি জুতা আমদানি করে নিজেদের লেবেল লাগিয়ে দোকানে বিক্রি করে। কর্মী সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে মার্কসবাদী সরকার পুঁজিপতি উৎখাতের নামে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলিকে শ্মশানে পরিণত করেছে। কলকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পের নাম এবং জমির পরিমাণ দেওয়া হলো— (১) গৌরীপুর জুটমিল ৭৫০ বিঘা, (২) অর্ণপূর্ণা মিল জগদ্দল ৬১০ বিঘা, (৩) টিটাগড় পেপার মিল ভাটপাড়া ৫৫০ বিঘা, (৪) ক্যান্টনমেন্ট বেয়বে বীজপুর ৪৩৫ বিঘা, (৬) মহালক্ষ্মী কটনমিল নোয়াপাড়া ৪০০ বিঘা, (৬) উলকাসকস ভাটপাড়া ৩৫০ বিঘা, (৭) ইন্ডিয়ান পেপার পাল্পস বীজপুর ৩৫০ বিঘা, (৮) বেঙ্গল এনামেল নোয়াপাড়া ৩০০ বিঘা, (৯) জনসন অ্যান্ড নিকলসন ২৬০ বিঘা, (১০) জনবার কটন মিল জগদ্দল ১৫০ বিঘা, (১১) অরিয়েন্টাল কটন মিল কামারহাটি ১৪; ৫০ বিঘা, (১২) আর আই সি বনহুগলী ১৫০ বিঘা, (১৩) হিন্দুস্থান লিভার ভাটপাড়া ১৩২ বিঘা, (১৪) বিরাটী টেক্সটাইল মিল ১০০ বিঘা, (১৫) জেসপ দমদম ১০০ বিঘা, (১৬) টিটাগড় জুটমিল ১০০ বিঘা, (১৭) মোহিনী কটন মিল কামারহাটি ১০০ বিঘা, (১৮) কামারহাটি বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং ৫০ বিঘা, (১৯) ক্যালকাটা সিল্কমিল খড়দা ৫০ বিঘা, (২০) হিন্দুস্থান সেপটি গ্লাস বেলঘরিয়া ৫০ বিঘা, (২১) পাণিহাটী হিন্দুস্থান ওয়ার লিঃ ৪০ বিঘা, (২২(বাখণ্ড কটন মিল সোদপুর ৪০ বিঘা, (২৩) টেক্সমেকো পাণিহাটী ওয়ার্কস ৩০ বিঘা, (২৪) বমনলাল ইন্ডাস্ট্রিজ ৩০ বিঘা, (২৫) কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং বরাহনগর ৩০ বিঘা, (২৬) বেঙ্গল এনামেল পলতা ২৫ বিঘা, (২৭) খড়দহ হিন্দুওয়্যার লিঃ ২৫ বিঘা, (২৮) এ.পি.এল রংকর ২৫ বিঘা, (২৯) এইচ এম ডি দমদম ২৫ বিঘা, (৩০) সোদপুর পটারিজ ২৫ বিঘা, (৩১) কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং ২৫ বিঘা, (২;৩২) শেখর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ২০ বিঘা, (৩৩) কমল প্লাইউড ১০ বিঘা, (৩৪) মুনবেরী মেশিনারিজ ১০ বিঘা। এছাড়া হাওড়ায় প্রায় ২৫ হাজার ছোটো কারখানা চৌপাট হয়েছে ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাদির ফলে। ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে। ওই জমিতে

গড়ে উঠেছে প্রমোটারি ব্যবসা। এই সুযোগ নিয়ে চীন তার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। অতএব এখন শিল্পপতিদের ঘুম ভাঙলেও চীনা সামগ্রী বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে মনে করি। তাসত্ত্বেও করতেই হবে।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

হিন্দুদের মুসলমান প্রীতির রহস্যটা কী?

৭১২ খ্রিস্টাব্দে বিন কাশিম ভারতের সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করে। পরবর্তীকালে সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করে এবং মোট ১৭ বার ভারতে আক্রমণ চালিয়েছিল। এরপর মহম্মদ ঘোরি, তৈমুরলং, বাবর, আহমেদ শাহ আবদালি, নাদির শাহ প্রভৃতি বিভিন্ন মুসলমান আক্রমণকারী বিভিন্ন সময়ে ভারত আক্রমণ করেছিল এবং মুসলমান শাসকরা ভারতে শাসনকার্য চালিয়েছিল ৫০০ বছর ধরে। সে সময় মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, উৎপীড়নে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল, অন্যথায় তাদের হত্যা করা হয়েছিল। তৈমুরলং দিল্লি আক্রমণ করার আগের রাতে এক লক্ষ বন্দি নিরস্ত্র হিন্দুকে হত্যা করে যাতে যমুনার জলপ্রবাহ হিন্দুর শবদেহে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং যমুনার জল লাল হয়ে গিয়েছিল। কয়েক হাজার হিন্দু মন্দির অপবিত্র করে পরে ধ্বংস করা হয়েছিল। মথুরা, বৃন্দাবন, সোমনাথের মন্দির, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির বা পুরীর জগন্নাথের মন্দির কোনওটাই রক্ষা পায়নি। রামমন্দির বা বাবরি ধাঁচার কথা তো কারও অজানা নয়। এ তো গেল অতীতের কথা। ১৯৪৬ সালে দেশভাগের আগে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সময় পঞ্জাবে গণহত্যা, কলকাতায় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস, নোয়াখালিতে জেনোসাইডের নামে যে নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছিল হিন্দুদের ওপর সে তো কারো বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সেটা উপেক্ষা করা যায় না। হিন্দু মোহান্ত বা পুরোহিত হত্যা, হিন্দুকন্যা অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো হতে দেওয়া হয় না মুসলমানদের আপত্তির কারণে। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে দেগঙ্গা, ধুলাগড়, উস্থি, নলিয়াখালি, জীবনতলা, কুলপি, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, কামদুনি, কালিয়াচক-সহ বিভিন্ন স্থানে হিন্দুরা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে হিন্দুকন্যাগণ নিগৃহীতা হচ্ছে, তার পরেও হিন্দু বিশেষ করে হিন্দুকন্যাদের এই মুসলমান প্রীতি রহস্যজনক মনে হয় না কী?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

শ্যামপ্রসাদ থাকবেন বাঙ্গালি হিন্দুর অন্তঃস্থলে

বাঙ্গলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে এই সিংহপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। মা যোগমায়া দেবী। শ্যামাপ্রসাদ ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি সবচেয়ে কম বয়সি সেনেট। ১৯২৯ সালে তিনি প্রথম

রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এখন যে ভারতীয় জনতা পার্টি, সেটাই তখন ছিল জনসঙ্ঘ। এই জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। ভারতমাতাকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর বলিদান বাঙ্গালি হিন্দুরা চিরদিন মনে রাখবে। আজ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ভিটেমাটি ছাড়া সহায়সম্বল হীন বাঙ্গালিরা যে স্থানে আশ্রয় নিয়েছে সেই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা তিনি।। পশ্চিমবঙ্গ নামটা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আর কোনো প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকবে না। মুসলিম লিগ প্রধান সুরাবর্দি এই স্থানটুকুকে পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু এই সিংহপুরুষ বাধ সেধেছিলেন । এই সামান্য স্থানটুকু থাকতো না যদি না শ্যামাপ্রসাদ বাধা হয়ে না দাঁড়াতেন। ৩৭০ ধারাকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। ৩৭০ ধারার অযৌক্তিক আবদারকে তিনি মানতে পারেননি বলে তাঁকে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। নেহরুর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এ শেখ আব্দুল্লাহর নির্দেশে কাশ্মীর এর নিষাদ বাগে একটি অন্ধকার ময় গৃহে এই বীরপুরুষের শেষ জীবন প্রদীপ নিভে গেল। অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০৪ সালে স্বীকার করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন নেহরু। পরিশেষে একটা কথাই বলবো, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা এই মহান পুরুষকে বাঙ্গালি হিন্দুরা কোনোদিনও ভুলবে না। তিনি থাকবেন হিন্দুদের অন্তরের অন্তস্থলে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

চীনা ড্রাগনের রোষানলে হংকং

এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র হংকং আবার সংবাদের শিরোনামে। সৌজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। চীন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের কোনো ভূমিকাই নেই। কমিউনিস্ট পার্টির নামে চলে একনায়কতন্ত্র। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীই ক্ষমতার রক্ষক ও নিয়ামক। চীনের জাতীয় চরিত্রের আগ্রাসী মনোভাব ও বিশ্বাসঘাতকতা আজ ভীষণ ভাবে প্রকট।

সম্প্রতি চীনা ড্রাগনের রোষানলে পড়েছে হংকং। চীনের দুটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল ম্যাকাও হংকং। ২৬০টিরও বেশি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গঠিত হংকং পার্ল নদীর ব-দ্বীপের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর উত্তরে চীনের কুয়াংতুং প্রদেশ এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে দক্ষিণ চীন সাগর অবস্থিত। নাগরিকদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও হংকংয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় চীন আজ মরিয়া। নিজেদের আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হংকংয়ে দেশদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা ঠেকানোর জন্য 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি ল' পাশ করে বেজিং। গত মে মাসের শেষ দিকে চীনের জাতীয় আইনসভা ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে আইনটি অনুমোদন পায়। মাত্র ১৫ মিনিটে ১৬২ জন সদস্য এই আইনের পক্ষে মত দেন। হংকংয়ের চীনপন্থী প্রশাসক ক্যারি ল্যাম এই আইন নিয়ে এখনও নিশ্চুপ। বিশেষজ্ঞদের মতে হংকংয়ে চীন বিরোধী সব ধরনের আন্দোলন বন্ধ করার জন্যই এই আইন। আগে নিয়ম ছিল হংকংয়ে কেউ কোনো অপরাধ করলে তার বিচার হংকংয়ের আইন মোতাবেক সেখানেই হতো। নয়া আইন অনুযায়ী জাতীয় নিরাপত্তার অভিযোগ কোনো ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে তাঁকে মূল চীনা ভূখণ্ডে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। এই আইন মোতাবেক গণতন্ত্রের দাবি করা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহের সমার্থক। এ পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু হংকংবাসীদের প্রতিবাদ থেমে নেই। আজ হংকংবাসী মুক্তির জয়গান গাইছেন এক অভিনব পন্থায়। শহরের বেশ কয়েকটি দোকান মুড়ে দেওয়া হয়েছে সাদা কাগজে। সাদা কাগজের দেওয়াল চীনা রাজনৈতিক দমনপীড়নের দ্যোতক।

২০১৯ সালে এমনই একটি আইনকে কেন্দ্র করে হংকংয়ের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। সে সময় বন্দি প্রত্যার্পণের সুযোগ রেখে চীন একটি আইন পাশ করতে চাইলে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন হংকংয়ের সাধারণ মানুষ। কয়েক মাসের টানা আন্দোলনে পিছু হটে চীন। পরাধীনতার শিকল নিয়ে আগ্রাসী মনোভাবের নতুন কৌশল ২০২০ সালের 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি ল' । এই আইনে হংকংয়ে কার্যত বিক্ষোভ, প্রতিবাদ নিষিদ্ধ হওয়ার মুখে। আগে যারা রাষ্ট্রবিরোধী বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এই জাতীয় নিরাপত্তা আইন। আজ অনেকেই গ্রেপ্তারের ভয়ে হংকং ছাড়তে চাইছেন।

১৯৯৭ সালে ব্রিটেন হংকং চীনকে কাছে ফিরিয়ে দেবার পর হংকংয়ের জন্য একটি ছোটোখাটো সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল। সেই সংবিধান অনুযায়ী হংকংয়ের যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা হলে, জরুরি অবস্থা জারি হলে জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে কিংবা দুর্যোগের সময় ত্রাণকাজে হংকং সরকারের অনুরোধে চীনের সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে। এই চীনা জাতীয় নিরাপত্তা আইনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, নতুন আইনটি পাশ করে হংকংয়ে ১৯৮৫ সালের সিনো-ব্রিটিশ যৌথ ঘোষণাকে লঙ্ঘন করেছে চীন। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে ব্রিটেন হংকংয়ের প্রশাসন ফিরিয়ে দেওয়ার পর ৫০ বছর অর্থাৎ ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ওই এলাকাটি কী কী ভোগ করবে অর্থাৎ 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতিতে হংকং পরিচালিত হবে। কিন্তু হংকংবাসীদের দাবি চীনের হস্তক্ষেপে তা হচ্ছে না। ব্রিটেন সরকার তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হংকংয়ের ৩০ লক্ষ বাসিন্দাকে ব্রিটেনে থাকতে এবং কাজ করতে দেওয়া হবে। তারা পাঁচ বছর ব্রিটেনে থাকার পর ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। হংকংয়ের বিক্ষোভকারীদের ওপর নিপীড়ন চালানো চীনা আধিকারিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবেন। হংকংয়ের বিক্ষোভকারীদের ওপর নিপীড়ন চালানো চীনা আধিকারিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে আবার বিল পাশ করেছে মার্কিন সিনেট। এছাড়া হংকং সম্পর্কিত এই বিতর্কিত বিল নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনে চীনের 'দাদাগিরি' নিয়ে সরব হয়েছে ভারত।

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় লালফৌজের সন্ত্রাসের পর হংকং নিয়ে আগ্রাসী চীনের জাতীয় নিরাপত্তা আইন এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। শুধু ভারত কিংবা হংকং নয়, চীনা ড্রাগনের হুমকির মুখে আজ ব্রুনেই, ফিলিপিনস, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, লাওস, কম্বোডিয়া, তাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভুটান, তাজাকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরঘিজস্তান এবং রাশিয়া। সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়ালে চীনা ড্রাগন চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে।

— অনু বর্মণ,
গোবিন্দ নগর, মদনপুর, নদীয়া।

বিক্রমাদিত্যের দশমরত্ন

আত্মজা বসু

আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমিতে আবির্ভূতা হন জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী নারী— লীলাবতী। তিনি সিংহলরাজ অনাচার্যের কন্যা। বরাহমিহিরের পুত্রবধূ। মিহিরপত্নী কিংবদন্তি খনা নামেই আমাদের সকলের কাছে চিরপরিচিতা। বঙ্গদেশের যে কয়জন বিদুষী রমণীর ইতিহাস জানা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির প্রথমজন ছিলেন খনা। জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষচর্চা, কৃষিবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা ও গার্হস্থ্যবিদ্যায় পারদর্শিনী খনার এছাড়াও যে কোনো বিষয়ে ছিল অগাধ জ্ঞান ও অবাধ বিচরণ। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত সদর মহকুমার দেউলিয়া গ্রামে (বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থল, যেটি খনামিহিরের ঢিবি নামে পরিচিত) খনার নিবাস ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। অজস্র খনার বচন যুগযুগান্তর ধরে গ্রামবাঙ্গলা তথা বাঙ্গালির জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশে আছে। ব্যাখ্যা ও অঙ্কের মাধ্যমে সমাধান বঙ্গদেশের এই বিদুষীর ভবিষ্যদ্‌বাণীই আসলে 'খনার বচন' বলে প্রচলিত— যা শ্লোক বা ছড়ার আকারে লেখা হতো। বলা বাহুল্য, খনার বচন বর্তমান যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক। খনার ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিষয়গুলো মূলত যাত্রাকালে শুভ লক্ষণ, নক্ষত্র গণনা, তিথি গণনা, মৃত্যু গণনা, জন্মলগ্নের শুভাশুভ, চন্দ্রগ্রহণ, পরমায়ু গণনা, গর্ভস্থ সন্তান গণনা, মড়ক গণনা ইত্যাদি। আজ থেকে হাজার বছর আগে এত যথার্থ ভাবে কী করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এত নির্ভুল ভাবে খনা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আজও আমাদের কাছে এক বিশাল বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায়। বঙ্গপ্রদেশে বস্তুভিত্তিক গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে খনার বচন অগ্রহ্য করা প্রায় অসম্ভব। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে খনার বক্তব্য

অনুযায়ী বাসগৃহ সর্বদা উঁচু ও খোলামেলা স্থানে নির্মাণ করা উচিত। গৃহে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা, পুকুর, খামার ও সবজির বাগান থাকা আবশ্যক। গৃহে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো হাওয়া প্রবেশের পথ থাকা প্রয়োজন। এর ফলে শীত ও গ্রীষ্ম দুই ঋতুর সমান সাম্যতা রক্ষিত হয়। গৃহে রান্নাঘর দক্ষিণ দিকে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ ধুলো ও রান্নার দূষিত বাতাস দখিনা বাতাসের সঙ্গে ভেতরের ঘরে প্রবেশ করে গৃহের বাসিন্দাদের অসুস্থ করে তুলবে। খনার বহুমুখি প্রতিভাকে বিচার করলে আমরা জানতে পারবো কী অসামান্য দূরদর্শিতার সঙ্গে কৃষিবিদ্যার সঙ্গে দর্শন, জ্যোতিষ ও স্থাপত্য বিদ্যার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের কৃষকদের মুখে যাতে সারা বছর হাসি থাকে তার ব্যবস্থা করেছেন। বস্তুভিত্তিক ছড়ার মধ্যে অন্যতম প্রধান—

পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে বেড়ে (কলা), দক্ষিণে ছেড়ে
ঘর করগো পোতা জুড়ে।

বাংলাদেশের পাবনা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব বাড়িই এই বাস্তুরীতি মেনে তৈরি হয়েছে। পুবে হাঁস অর্থাৎ গৃহের পূর্বদিকে সর্বদা পুকুর খনন করে সেই দিকে গবাদি পশু ও হাঁস, মুরগির চাষ করা উচিত। বাঁশ গাছ পশ্চিমে পুঁতলে সূর্যের প্রখর রোদ আটকাবে ও গৃহকে শীতল রাখতে সাহায্য করবে। কলাগাছ উত্তরে থাকলে তা উত্তম। আলো হাওয়াকে কখনোই বাধাপ্রাপ্ত করবে না। আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টাব্দে চরক সংহিতায় উল্লেখ আছে— 'দক্ষিণা বাতাস মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে', খনাও এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে গৃহ সর্বদা দক্ষিণ দিক ছেড়ে বা খোলা রেখে গৃহ নির্মাণ করতে বলেছেন।

খনা আরও বলছেন,

বাড়ির কাছে ধান গাছ,
যার মার আছে ছা
চিনিস বা না চিনিস
খুঁজে দেখে গোরু কিনিস।

এর অর্থ বাড়ির কাছে ধানের জমি থাকলে এবং সেই জমিতে চাষ করলে লাভবান হওয়া যায় বেশি, কারণ ধান চুরি যাবার ভয় থাকে না এবং পাহারা দেওয়ার জন্য পয়সা দিয়ে লোক রাখতে হয় না। গোরু না চিনলেও ভালো করে দেখে কেনা হলে বেশি লাভবান হওয়া যায়। কৃষিকাজে সফলতার জন্য খনা বলেছেন—

শুনরে বাপু চাষার বেটা
মাটির মধ্যে বেলে যেটা,
তাতে যদি বুনিস পটোল
তাতে তোর আশার সফল।

অর্থাৎ আমরা জানি বেলে মাটি অনুর্বর। কোনো ভালো ফসল হয় না, কিন্তু খনার কথা শুনে যদি কেউ সেই মাটিতে পটোল চাষ করে তাহলে সেই চাষির সব আশা পূর্ণ হবে বা বলা যায় তিনি লাভবান হবেন। খনা আরও বলেছেন :

ষোল চাষে মূলা
তার অর্ধেক তুলা।
তার অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান।

১৬ বার লাঙ্গল দেওয়ার পর সেই জমিতে মুলো চাষ করলে ভালো ফসল পাওয়া যায়। তুলা লাগানোর জমিতে ৮ লাঙ্গল করতে হবে, ধানের জমিতে ৪ বার লাঙ্গল করে ধান লাগালে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং পানের জমিতে চাষের প্রয়োজন নেই, বিনা চাষে পান ভালো হয়। এছাড়া—

যদি বর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজার, পুণ্য দেশ।

অর্থাৎ মাঘের শেষের বৃষ্টিপাতে রাজা ও দেশের কল্যাণ। যাত্রাকালে আমাদের অতি পরিচিত—

মঙ্গলে উষা, বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।

এছাড়া

ভরা হতে শূন্য ভালো, যদি ভরতে যায়,
আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে মায়।

এর অর্থ, খালি কলসী দেখে যাত্রা করা অশুভ ও যাত্রাকালে পেছন থেকে মায়ের ডাক অত্যন্ত শুভ। প্রাত্যহিক শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য অনেক রকম শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—

আলো হাওয়া বেঁধো না,
রোগে ভুগে মরো না।

অর্থাৎ আলো হাওয়ায় প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি হলে কখনই শরীর সুস্থ রাখা সম্ভব নয় এবং

জর ভিটায় তুলে ঘর,
যে আসে তারই জ্বর।

অর্থাৎ অপরিষ্কার ও ভিজে জমিতে ঘর তুললে সেই গৃহে সদা জ্বর, সর্দিকাশি লেগে থাকবে। আবার,

ফল খেয়ে জল খায়,
যম বলে আয় আয়।

এছাড়া, যত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্ট,
তথ জ্বালে ভাত নষ্ট।

অর্থাৎ অতিরিক্ত পাক মিষ্টির জন্য ভালো, কিন্তু ভাত রান্নার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অথবা,

সকাল শোয়, সকাল ওঠে
তার কড়ি না বৈদ্য লুটে।

অর্থাৎ রাত না জেগে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলে, তাকে আর চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে না। এইরকম অসংখ্য জনস্বাস্থ্যবিধির উপর ছড়া খনা আমাদের জন্য রচনা করে গেছেন। খনার বহুমুখী প্রতিভার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসেবে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নের সঙ্গে দশমরত্ন হিসেবে স্থান লাভ করেন। এই স্বীকৃতি খনা অর্জন করেন স্বয়ং তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহিরকে নক্ষত্র গণনায় পরাজিত করলে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য খনাকে তাঁর রাজসভায় দশমরত্ন হিসেবে অলংকৃত করতে অনুরোধ জানান, কিন্তু অদৃষ্টের করুণ পরিণতিতে ও সমজের গভীর চক্রান্তে খনাকে নিজের জিভ কেটে আত্মহুতি দিতে হয় এবং চিরস্মরণীয় বাগ্মী খনা চিরকালের জন্য মূক হয়ে যান। খনার পরিণতি যাই হোক না কেন ভারতের ইতিহাসে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষচর্চায় প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব খনাকে আমাদের চিরকাল মনে রাখা উচিত এবং বাঙ্গলার ঘরে ঘরে চির প্রাসঙ্গিক খনার বচন মনে রেখে, আমাদের তা মেনে চলা উচিত নিজেদেরই মঙ্গলার্থে। তাইতো খনা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, 'যে না শোনে খনার বচন, সংসারে তার চিরপচন।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে বিজ্ঞানমনস্কতার সৌজন্যে আমরা আমাদের এই সংস্কৃতি, ইতিহাস, গর্ব সব বিসর্জন দিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যকলা বিভাগের গবেষকেরা ও আমেরিকার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণা বিভাগ-সহ বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় খনার জীবনী ও খনার বচনের উপর নিরন্তর গভীরভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক শাখায় আলোকপাত করে চলেছেন, যা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা।

(লেখক গবেষক,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা বিভাগ)

ভুল সংশোধন

গত ১৩ জুলাই সংখ্যায় প্রবাল চক্রবর্তীর 'সান জু, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও তিব্বত' প্রবন্ধে ২০ পৃষ্ঠার শেষ স্তবকে **লক্ষ লক্ষ হান বংশীয় তিব্বতীয় ভাই-বোনেদের কথা ভুলে যাবেন না** স্থলে পড়তে হবে **লাখে লাখে হান বংশীয় চীনারা তাদের দেশে এসে তাদেরকে নিজভূমে পরবাসী করে দিয়েছে। বেয়নটের ডগায় বেঁচে মরে থাকা সেই দুঃখী তিব্বতীয় ভাই-বোনেদের কথা ভুলে যাবেন না** পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —স্বঃ স।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

SURYA

Energising Lifestyles

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

lighting

fans

appliances

pipes

SURYA ROSHNI LIMITED

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657

/suryalighting I /surya_roshni